গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

BIGYAN ANNESWAK

বর্ষ - ১৭ সংখ্যা-১ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২০ WBBEN/2003/11192 মূল্য : ১৫ টাকা

সূচি

১ আমাদের কথা

২০১৯-এ চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ২
ডা: শঙ্কর কুমার নাথ

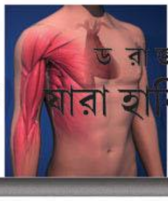

পদার্থ বিদ্যায় নোবেল ২০১৯ ৪
রতন দেবনাথ

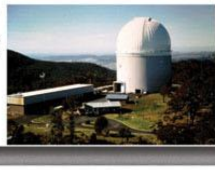

ড রাজা রাউত
যারা হারিয়ে যাচ্ছে

অর্থনীতিতে নোবেল দারিদ্র দূরীকরণের নতুন দিকনির্দেশ ৫
সাগ্নিক

৮ বিকল্প শক্তির আঁতুরঘর
তপন দাস

১০ গাছের প্রাণ
প্রণব নাথ চক্রবর্তী

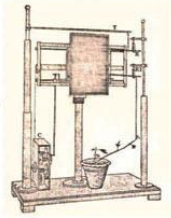

১৪ আপেক্ষিক তত্ত্ব একটি সহজ পাঠ
অনিন্দ্য দে

১৮ দৃষ্টি পরিধি
ডা: শিবপ্রসাদ পাল

১৯ সংবাদ

২০ গুননীয়ক ও গুনিতক
মনতোষ মিত্র

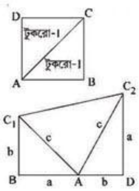

২২ ডিম
জয়দেব দে

২৩ শব্দজব্দ
অনিন্দ্য দে

একাধিক সূর্যযুক্ত নক্ষত্র মন্ডল ২৩
অমিতাভ চক্রবর্তী

২৪ জ্যোতিষের শূন্য গর্ভতা মহাবিশ্বের বিশালতা
গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

২৫ পরিবেশ আইন বিলীয়মান জীববৈচিত্র
বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

কবিতা ২৮
সুব্রত রুদ্র
জগন্ময় মজুমদার
সুনীল শর্মাচার্য
প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবপ্রসাদ পাল
নির্মাল্য দাশগুপ্ত

৩০ আন্তঃ সীমান্ত নদী
অনুপ হালদার

৩৩ যারা হারিয়ে যাচ্ছে
রাজা রাউত

বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক

তাপস মজুমদার

সম্পাদকমণ্ডলী

জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সর্দার, জগন্ময় মজুমদার, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল

: website :
www.ssu2011.com/bigyan-anneswak

: e-mail :
1. bigyanannesak1993@gmail.com.
2. bijnandarbar1980@gmail.com.

: Whatsapp No. :
8240665747 (Samrat Sarkar)
9143264159 (Anup Haldar)

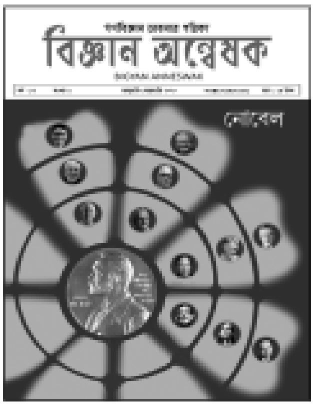

প্রচ্ছদ, বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা

তাপস মজুমদার

সুভাষিতম্

'বাইরে চারি দিকেই যখন হাওয়া-বদল, পাতা বদল, রঙ বদল, আমরা তখনও গোরুর গাড়ির বাহনটার মতো পশ্চাতে পুরাতনের ভারাক্রান্ত জের সমানভাবে টানিয়া লইয়া একটানা রাস্তার ধুলা উড়াইয়া চলিয়াছি।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের কথা

বসন্ত

'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত।'

আজ বসন্ত কেননা নবকলেবরে বিজ্ঞান অন্বেষকের প্রকাশ।
আজ বসন্ত কেননা রঙীন প্রচ্ছদে রামধনু।
আজ বসন্ত আরো আরো বিষয় বৈচিত্রে।
আজ বসন্তে অন্ধকার কুসংস্কার ছিঁড়ে ফেলার সুযোগ।
আজ বসন্ত কেননা প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কলরব।
আজ বসন্ত কেননা অভিযানের শর্ত এগিয়ে চলার।
আজ বসন্তে বসন্তে পরিবেশ রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আজ ফাগুন বসন্তে পাঠকে লেখকে মিলনে মিলন।

—তাপস মজুমদার

বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

যোগাযোগ : ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২/৮৩৩৬০৪৩০৪৮

ডা: শঙ্কর কুমার নাথ

২০১৯-এ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

উইলিয়াম কেইলিন

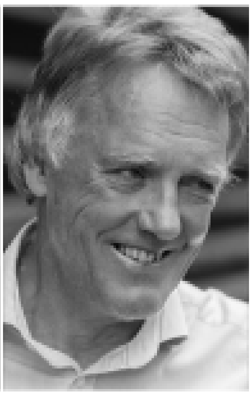

পিটার র‍্যাটক্লিফ

গ্রেগ সেমেনজা

২০১৯ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞান বা শারীরবিজ্ঞান বিষয়ে যে তিনজনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন ডা: উইলিয়াম কেইলিন (জুনিয়র), স্যার পিটার র‍্যাটক্লিফ এবং ডা: গ্রেগ সেমেনজা।

কেইলিনের জন্ম ১৯৫৭ সালে নিউইয়র্কে। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন রসায়ন এবং গণিতবিদ্যায়, পরে ১৯৮২ সালে MD করেন। কাজ করেছেন জন্স হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডানা-ফারবার ক্যানসার ইনস্টিটিউটে। এরপর ডেভিড লিভিংস্টোনের রসায়নাগারে রেটিনোব্লাসটোমা রোগের উপর কাজ করে সাফল্য পান। চোখের রেটিনার একধরনের ক্যানসারকে রেটিনোব্লাসটোমা বলা হয়। এরপর কাজ শুরু করেন বংশগত একটি রোগ নিয়ে, যার নাম ভন হিপ্পেল-লিনডাউ রোগ (Von Hippel-Lindau disease)। ২০০২ সালে কেইলিন হার্বার্ড মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ডা: কেইলিন ১৯৮৮ সালে বিয়ে করেছিলেন একজন স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীনী ডা: ক্যারোলিন কেইলিনকে। ক্যারোলিন নিজেও ছিলেন ক্যানসার-সার্জন। এঁদের দুই সন্তান।

স্যার পিটার র‍্যাটক্লিফের জন্ম ১৯৫৪ সালে ইংল্যান্ডের ল্যাংকাশায়ারে। র‍্যাটক্লিফ হলেন একজন চিকিৎসক গবেষক, বিশেষ করে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল কিডনির রোগ সম্পর্কে। তিনি অক্সফোর্ডের জন র‍্যাডক্লিফ হাসপাতালের চিকিৎসক ছিলেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের নাফিল্ড বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ২০০৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত। পরে ২০১৬ সালে তিনি ফ্র্যান্সিস ক্রিক ইনস্টিটিউটের ডিরেকটর হয়েছিলেন। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল কিডনি থেকে উৎপাদিত এরিথ্রোপোয়েটিন নামক এক হরমোন বিষয়ে। র‍্যাটক্লিফ ১৯৮৩ সালে বিয়ে করেন মেরি ম্যাকডুগালকে।

ডা: গ্রেগ সেমেনজা-র জন্ম ১৯৫৬ সালে নিউইয়র্কে। ডা: সেমেনজা জন্স হপকিনস্ ইনস্টিটিউট স্কুল অফ মেডিসিনের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি হলেন বিকিরণ চিকিৎসার ক্যানসার বিশেষজ্ঞ। হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়েছেন, পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমডি এবং পিএইচডি দুইই করেছেন। শরীরে হাইপক্সিয়া-ইনডিউসিবল্ ফ্যাক্টর (HIF) খুঁজে বার করবার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এখন কাজ করছেন জন্স হপকিনস্ ইনস্টিটিউটে। সেমেনজা বিয়ে করেছেন লরা কাম্প সেমেনজাকে।

এবার আসি যে গবেষণা করে এঁরা নোবেল পুরস্কার পেলেন, সেই গবেষণার বিষয়ে।

আমরা সবাই জানি আমাদের বেঁচে থাকতে গেলে অক্সিজেন অপরিহার্য। অক্সিজেন ছাড়া আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। আর এই অক্সিজেন আমরা পাই এই পরিবেশ থেকে, তার বাতাস থেকে। সেই অক্সিজেন আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিই, আর তা পৌঁছে যায় ফুসফুসে। সেখান থেকে রক্তের নালিকার মাধ্যমে প্রবেশ করে রক্তের ভিতর—সেই অক্সিজেন তখন রক্তের লাল-কণিকার ভিতরে অবস্থিত হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং হিমোগ্লোবিন সেই অক্সিজেনকে রক্তসংবহনের মাধ্যমে আমাদের সমগ্র শরীরের কোটি কোটি কোষে পৌঁছে দেয়। খাবারের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে প্রতিটি কোষকে বাঁচিয়ে রাখে শক্তি যুগিয়ে। প্রসঙ্গত, এনিমিয়া বা রক্তাল্পতা অবস্থা হলে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রাও কমে যায়।

কিন্তু সর্বদাই কি আবহাওয়ামন্ডল থেকে আমরা একই পরিমান অক্সিজেন পাই? এইটা নির্ভর করে আমরা কোথায় অবস্থান করছি তার উপর। যেমন সমতলে পরিবেশে যে পরিমান অক্সিজেন রয়েছে, পাহাড়ে উঠলে—যত উপরে যাওয়া যায় ততই অক্সিজেনের পরিমান কমতে থাকে। আর অক্সিজেন কম হলে তো আর চলবে না, ঠিক ঠিক পরিমান চাই শারীরবৃত্তীয় কাজগুলিকে স্বাভাবিক রাখতে। আরও একভাবে আমাদের শরীরে অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা কমবেশি হয়। যদি অলস হয়ে বসে থাকি, তাহলে কিন্তু অক্সিজেনের প্রয়োজন কম হয়। আবার শারীরিক কাজকর্ম বৃদ্ধি করে দিলে অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে বেশি। যেমন শরীরে অক্সিজেন কম হয়ে গেলে আমরা দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে তা পূরণ করবার চেষ্টা করি, শরীরে অক্সিজেন স্বাভাবিক থাকলে শ্বাস-প্রশ্বাসও স্বাভাবিক থাকে। বলে রাখা ভাল, শ্বাস-প্রশ্বাসের এই দ্রুততা বা স্বাভাবিকত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্যারোটিড বডি নামে দুটি ছোটি অংশ, যা থাকে গলার (Neck) দুপাশে ক্যারোটিড ধমনীর সঙ্গে।

এই তিন বিজ্ঞানী চিকিৎসক যে গবেষণাগুলি করেছেন, তা থেকে আমরা জানতে পেরেছি, শরীরের কোষগুলি ঠিক কিভাবে বুঝতে পারে যে, বাইরের পরিবেশে যে অক্সিজেন রয়েছে, তা শরীরের পক্ষে কম না বেশি।

আসলে হয় কি, অক্সিজেন যদি কম পড়ে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
www.print-driver.com

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

কিডনি থেকে একটি প্রোটিনজাত হরমোন এরিথ্রোপোয়েটিন (Erythropoietin) নিঃসরণ হতে থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ চলে যায়—রক্তে আরও আরও লালকণিকা তৈরি করার, যাতে অক্সিজেনের পরিমান পর্যাপ্ত হতে পারে শরীরে। প্রসঙ্গত, শরীরে অক্সিজেনের পরিমান কমে গেলে সেই অবস্থাকে বলা হয় হাইপক্সিয়া (Hypoxia)।

অনেকদিন ধরেই র‍্যাটক্লিফ এবং সেমেনজা এই বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এঁরা দেখালেন, শুধু কিডনিই নয় শরীরের অন্যান্য অঙ্গও বুঝতে পারে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেছে, না বেশি হয়ে গেছে। এঁরা তাঁদের গবেষণায় খুঁজে পেলেন আরও একটি প্রোটিন, যা ঐ এরিথ্রোপোয়েটিন হরমোন নিঃসরণে সাহায্য করে। এই প্রোটিনটার নাম দেওয়া হল হাইপক্সিয়া-ইনডিউসিবল ফ্যাক্টর (HIF)। ফলে জানা গেল, শরীরে অক্সিজেনের স্তর কম-বেশি হলে HIF কম-বেশি হয়।

আর অন্যদিকে কেইলিন কিন্তু খুঁজে বার করলেন বিভিন্ন রোগে এই HIF কেমনভাবে কাজ করে। তিনি কাজ করছিলেন একটি জিনঘটিত রোগ নিয়ে, যার নাম ভন হিপ্পেল-লিনডাউ রোগ (VHL) নিয়ে, যা আগেই বলেছি। এই VHL রোগটিতে একসাথে দেহের অনেকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই টিউমার হতে পারে—মস্তিষ্কে, স্পাইনাল কর্ডে, চোখের ভিতর, কিডনি ইত্যাদি স্থানে ক্যানসারও হতে পারে। কেইলিনের গবেষণায় জানা গেল, VHL প্রোটিন HIF-কে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে এবং সে-সব ক্ষেত্রে VHL প্রোটিন পাওয়া যায় না, সেখানে HIF অত্যধিক মাত্রায় এরিথ্রোপোয়েটিন উৎপাদন করে ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে। আসলে ক্যানসার কোষগুলিরও তো বৃদ্ধি, পুষ্টির জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, আরও বেশি করে রক্তবাহী ধমনীর প্রয়োজন হয়।

তাই, এই তিন বিজ্ঞানীর গবেষণাগুলি একসাথে এসে এক জায়গায় মিলে গেল, তখন মানুষ খুঁজে পেল নতুন দিশা, যেখান থেকে বহু রোগের, বিশেষ করে ক্যানসার চিকিৎসায় নবদিগন্ত খুলে যাবে ভবিষ্যতে, তা নিশ্চিত।

M. 9433309056

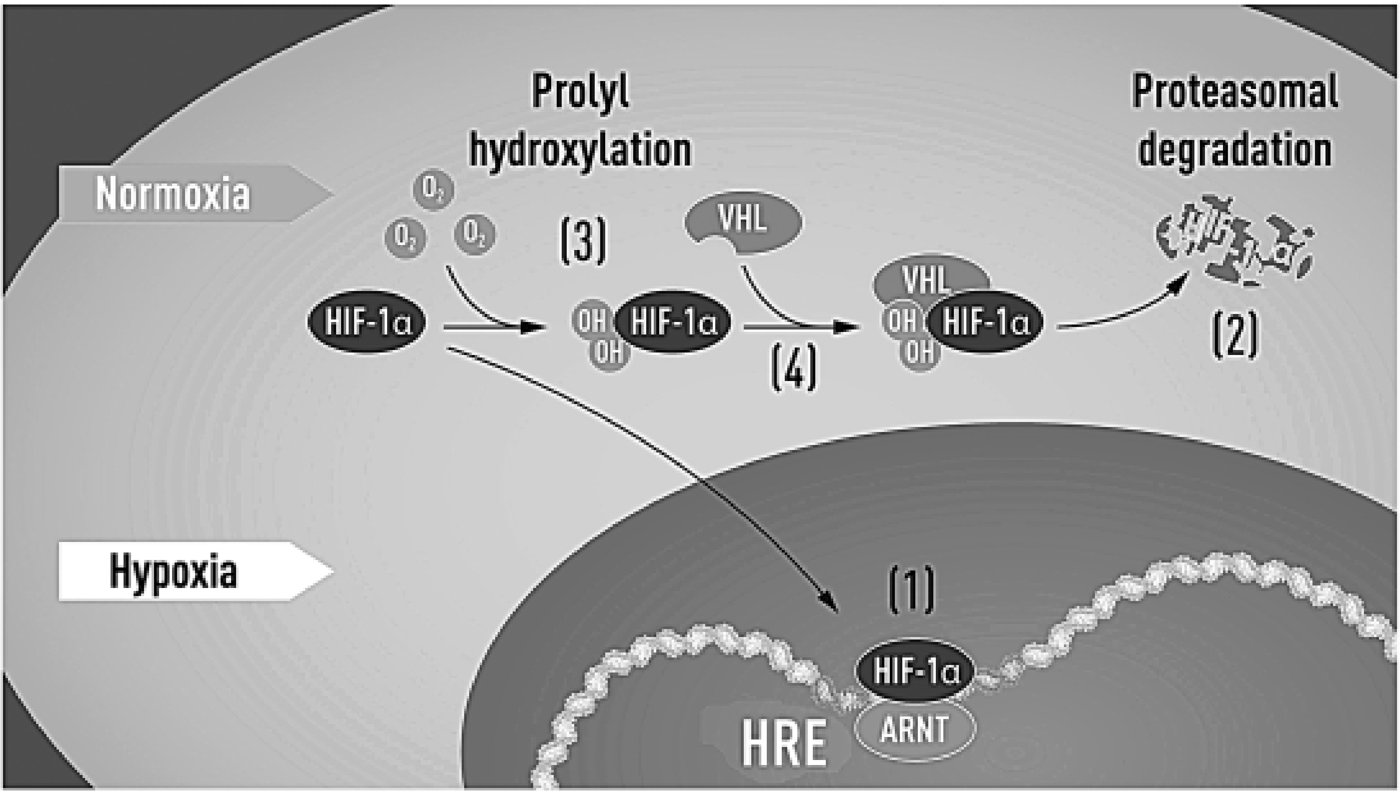

যখন অক্সিজেনের পরিমাণ কম (হাইপক্সিয়া), HIF-1α ধ্বংসে হওয়া থেকে সুরক্ষিত হয় এবং তখন নিউক্লিয়াসে জোটবদ্ধ হয় এবং ARNT-এর সাথে যুক্ত হয়ে DNA তন্ত্রীর (HRE) সাথে যুক্ত হয় (H)। কিন্তু অক্সিজেনের পরিমাণ যখন স্বাভাবিক থাকে, HIF-1α HIF-1α প্রোটিয়াসোম দ্বারা ভেঙে যায় (2)। এখানে OH হাইড্রক্সিল গ্রুপকে HIF-1α-এর সঙ্গে যুক্ত করে ভাঙে অক্সিজেনের প্রভাবে। তখনি VHL প্রোটিনকে পাওয়া যায় এবং এটি HIF-1α-এর সঙ্গে একটি জটিল গঠন করে ধ্বংসের দিকে চলে যায়। এটি অক্সিজেন নির্ভরতার উপর চলতে থাকে।

রতন দেবনাথ

পদার্থবিদ্যায় নোবেল ২০১৯

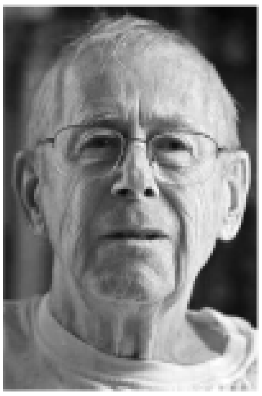
ফিলিপ জেমস এডুইন পিবল

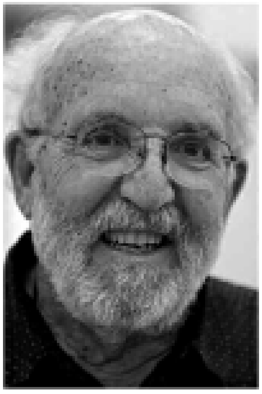
মিসেল মেয়র

ডিডিয়ের কেলোজ

২০১৯ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন তিনজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। জ্যোতির্বিদ, জ্যোতিঃপদার্থবিদ তথা তাত্ত্বিক সৃষ্টিতত্ত্ববিদ ফিলিপ জেমস এডুইন পিবল পেলেন পুরস্কারের অর্ধাংশ এবং বাকি অর্ধাংশ ভাগ করে নিলেন সুইডেনের জ্যোতিঃ-পদার্থবিদ মিসেল মেয়র এবং সে দেশেরই আর এক জ্যোতির্বিদ ডিডিয়ের কেলোজ।

জেমস পিবলসকে দেওয়া হল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং তার বিবর্তন সংক্রান্ত তাত্ত্বিক গবেষণার স্বীকৃতি এবং মিসেল মেয়র এবং তাঁরই ছাত্র ডিডিয়ের কেলোজ পেলেন সৌরজগতের বাইরেও আরও সৌরজগতের সন্ধানের স্বীকৃতি।

আমাদের এই মহাবিশ্বের উত্থান এবং তার বিবর্তনের চিত্রপট হল কসমোলজি বা সৃষ্টিতত্ত্ব বিজ্ঞান। প্রায় চৌদ্দ বিলিয়ন বছর আগে এক মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং-এর মাধ্যমে শুরু হওয়া এই মহাবিশ্ব বিবর্তনের হাত ধরে পেরিয়ে এসেছে এতগুলো বছর। কেমন ছিল সেই আদি মহাবিশ্ব? আর তার বিবর্তনের রূপরেখাই বা ছিল কেমন? এসব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজেছেন পিবল। স্থাপনা করেছেন আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্ববিদ্যার ভিত্তিপ্রস্তর। আর তার স্বীকৃতিই এই নোবেল পুরস্কার।

আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালবার্ট আইনস্টাইন প্রফেসর এমেরিটস জেমস পিবল কাজটা শুরু করেছিলেন ষাটের দশকে। তাঁর গবেষণার অনেকটাই ছিল মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য সন্ধানী প্রাকৃতিক সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত। একটা সময় ছিল যখন গবেষণার এই দিকটা মানুষকে নতুন আলোর সন্ধানে নিরাশ করেছিল, তখনও পিবলস আঁকড়ে ধরেছিলেন তাঁর গবেষণা। আর কিছুটা দেরিতে হলেও তার ফল পেলেন নোবেল জয়ের মাধ্যমে।

একটা বিষয় হয়ত আমাদের সকলকেই কখনো না কখনো ভাবায়। তা হল এই সুদূরপ্রসারী মহাবিশ্বের উৎস কি? কিভাবেই বা সৃষ্টি হল এত এত গ্যালাক্সি, গ্রহ-নক্ষত্রের দল। একটা সময় ছিল যখন বিশেষজ্ঞরাও মনে করতেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম বলে কিছু নেই। আবহমানকাল ধরেই তা একই রকম। কিন্তু ধারণাটা পালটে গেল ১৯২০-র দশকে। দেখা গেল এই মহাবিশ্ব ক্রমপ্রসারমান। স্থির নয়। তাহলে তো এর অতীত বলে কোনকিছু থাকার কথা। আর ভবিষ্যৎটাও থাকবে না বর্তমানের মত। অর্থাৎ মহাবিশ্বের শুরু বলে তাহলে একটা কিছু অবশ্যই আছে। ১৯৬৪ সালে দুই আমেরিকান বিজ্ঞানী আর্নো পেনজিয়াস এবং রবার্ট উইলসন প্রমাণ করলেন এক মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং-এর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল এই মহাবিশ্বের।

বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুসারে আনুমানিক চৌদ্দ বিলিয়ন বছর আগে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় থেকে তার সম্প্রসারণ চলছিল ক্রমাগত। ক্রমশ শীতল হচ্ছিল মহাবিশ্ব। সময়ের সাথে তার ঘনত্বও কমছিল দ্রুততার সাথে। সৃষ্টির শুরু থেকে প্রায় চার লক্ষ বছর ধরে মহাবিশ্বকে ভরিয়ে তোলে এক বিকিরণ।

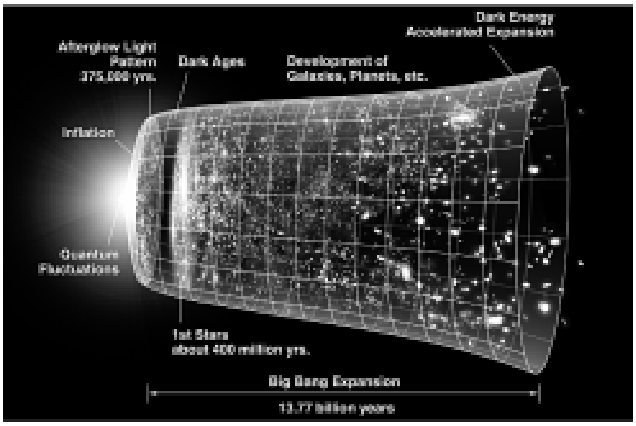

যার রেশ রয়ে গেছে আজও পর্যন্ত। আর এই বিকিরণেই লুকিয়ে রয়েছে মহাবিশ্বের শৈশবের গাঁথা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় যার নাম কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন। পিবলস তাঁর তাত্ত্বিক গবেষণা এবং গাণিতিক হিসাব-নিকাশের সাহায্যে কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন-এর অস্তিত্বের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এবং পরে সত্যি সত্যিই তার অস্তিত্ব ধরা পড়ে। শুধু তাই নয়। রহস্যময় আঁধার শক্তি এবং আঁধার বস্তুকেও আলোকিত করেছেন তাঁর গবেষণার মাধ্যমে।

বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তুর সমাহার এই মহাবিশ্ব। যেখানে রয়েছে আলোয় ভরা নক্ষত্র, নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠাসা গ্যালাক্সি আর গ্যালাক্সি গ্যালাক্সিতে ঠাসা মহাবিশ্বের সুবিশাল ব্যাপ্তি। তারায় তারায় রয়েছে ব্যবধান। ব্যবধান রয়েছে এক গ্যালাক্সির সঙ্গে আর এক গ্যালাক্সির। সে ব্যবধানও ছোট-খাট কোন ব্যবধান নয়। তাহলে, তারায় তারায় যে বিশাল ব্যবধান, এক গ্যালাক্সির সাথে আর এক গ্যালাক্সির যে ফাঁক—কি রয়েছে সেই ফাঁকে? একটা সময় ছিল যখন মনে করা

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
www.print-driver.com

হত, এসব মহাশূন্য। তাতে নেই কিছুই। একেবারে ফাঁকা। কিন্তু ধারণাটা পাল্টে দিয়েছে পিবলসের গবেষণা। তাত্ত্বিক গবেষণায় পিবলস দেখিয়েছেন বস্তুজগৎ মোটামুটিভাবে পাঁচ শতাংশের বেশি নয় আর বাকি পঁচানব্বই শতাংশই হল অদৃশ্য জগৎ বা আঁধার বস্তু এবং আঁধার শক্তিতে ভরা।

১৯৯৫ সালে মিশেল মেয়র এবং তাঁর ছাত্র ডিডিয়ের কেলোজ আবিষ্কার করলেন একটি গ্রহ যা চক্কর কাটছে একটি নক্ষত্রকে ঘিরে ঠিক যেমন করে ঘোরে আমাদের পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে। ৫১ পিগেসাস বি নামের এই গ্রহটিই হল প্রথম আবিষ্কৃত এক্সোপ্লানেট। এক্সোপ্লানেট হল সেসব গ্রহ যা আমাদের সৌরজগতের বাইরে কোন না কোন তারাকে ঘিরে তার চারপাশে আবর্তন করে। নাই বা থাক তাতে প্রাণের অস্তিত্ব, নাই বা হল এটি বাসযোগ্য। ৫১ পিগেসাস গ্রহটি আকারে বেশ বড়—প্রায় আমাদের বৃহস্পতি গ্রহের সমান।

মেয়র এবং কেলোজ-এর এই আবিষ্কার খুলে দিয়েছে নতুন নতুন গ্রহ আবিষ্কারের এক নয়া দিগন্ত। আজ পর্যন্ত আমাদের এই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতেই সন্ধান মিলেছে কম করেও প্রায় ৪০০০ গ্রহের।

পৃথিবীতে বসে টেলিস্কোপ-এর সাহায্যে দূরের গ্রহের সন্ধান করা বেশ শক্ত কাজ। প্রথমতঃ গ্রহের নিজস্ব কোন আলো নেই। তাই আলো দেখে গ্রহ চিনে নেওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। দ্বিতীয়ত যে তারার আশেপাশে গ্রহটি রয়েছে তার আলোতেই চাপা পড়ে যায় সে। আলাদা করে চেনার উপায় থাকে না। তবে একটা উপায় আছে। তা হল, যে তারাটিকে ঘিরে ঘুরছে গ্রহটি, গ্রহটির টানে সেই তারার নড়াচড়া দেখে বোঝা যেতে পারে গ্রহটিকে। আর তারার নড়াচড়া বুঝতে গেলে দরকার যে যন্ত্রের তা হল স্পেকট্রোমিটার। মেয়র এবং কেলোজ গুরু-শিষ্য দুজনে মিলে তৈরি করে ফেললেন এক উন্নত মানের স্পেকট্রোমিটার। বসানো হল দক্ষিণ ফ্রান্সের হাঁতে-প্রভেন্স মানমন্দিরে ১৯৯৪ সালে। শুরু হল খোঁজ। অবশেষে মিলল সাফল্য। ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে সত্যিই তাঁরা আবিষ্কার করলেন এক গ্রহ। সৌরজগতের বাইরে আবিষ্কৃত প্রথম গ্রহ। পৃথিবী থেকে প্রায় ৫০ আলোকবর্ষ দূরে পিগেসাস তারামন্ডলে। নামকরণ করলেন '৫১ পিগেসাস বি'।

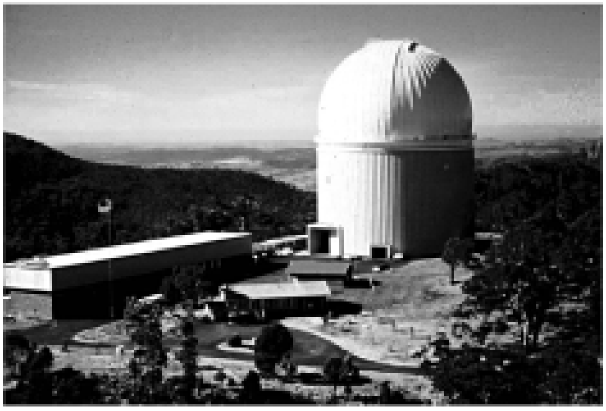

রয়েল অবজারভেটরী গ্রীনউইচ

email : ratandebnath@gmail.com • M. 9477934928

প্রচ্ছদ কথা-৩

সাগ্নিক

অর্থনীতিতে নোবেল : দারিদ্র দূরীকরণের নতুন দিকনির্দেশ

গবেষণাগারে একটি নতুন ওষুধ তৈরি হয়েছে। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদের উপর ওষুধের প্রয়োগে সাফল্য এসেছে। কিন্তু মানুষের উপর প্রয়োগে ওষুধটিতে আদৌ ফল পাওয়া যাবে কি? পাওয়া গেলেও তা কতটা লাভজনক? এর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াই-বা কী কী হতে পারে? সকল উত্তর জানতে একটি প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে যাদের উপর প্রয়োগ করা হবে তাদের দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়। এক—যাঁরা ওষুধটি ব্যবহার করবেন। এঁদের 'পরীক্ষামূলক বিভাগে' রাখা হবে। দুই—যাঁরা ওষুধটির ব্যবহার করবেন না, তাঁদেরটা হবে 'কন্ট্রোল বিভাগ'। এখন দুটি বিভাগকেই মিশিয়ে দেওয়া হল। আবার প্রতিটি নমুনা নেওয়া হল এলোমেলোভাবে। এরপর মূল্যায়ন হবে বিভিন্ন সূচকের মাধ্যমে। ধরা পড়বে পরীক্ষামূলক বিভাগটি

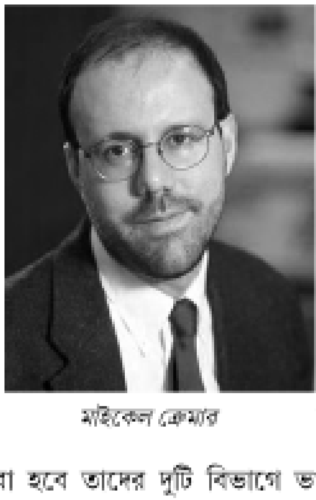

মাইকেল ক্রেমার

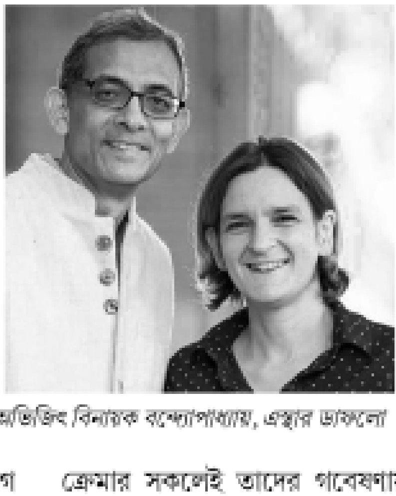

অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, এস্থার ডাফলো

উপকৃত হল কিনা। 'কন্ট্রোল' বিভাগের সূচকেও জানা যাবে অনেক অজানা তথ্য। এই পরীক্ষা পদ্ধতিটিকে বলে 'Randomised Controlled Trials (RCT)', বাংলায় বলা যায় বিধিবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত, সমবিভাজিত নিরীক্ষণ পদ্ধতি। প্রসঙ্গক্রমে ২০১৯-এর অর্থনীতির নোবেল বিজেতা ত্রয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, এস্থার ডাফলো এবং মাইকেল ক্রেমার সকলেই তাদের গবেষণায় RCT পদ্ধতিটির সফল প্রয়োগ করেছেন।

১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেল ক্রেমার পদ্ধতিটির প্রয়োগ করলেন। কেনিয়ার গরিব পল্লিতে 'মানবিক মূলধন' ওষুধ— (চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রকৌশল) RCT পদ্ধতির মাধ্যমে প্রয়োগ করলেন। পরীক্ষাটিতে বিদ্যালয় শিশুদের কৃমিনাশক ওষুধ দেওয়া,

বিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য আর্থিক পুরস্কার নির্ধারণ করা ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু উন্নয়নের সঠিকপথ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছিল। অভিজিৎ ও ডাফলো দুজনে এই পদ্ধতির অনুসরণ করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হল RCT পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে এই ত্রয়ী অর্থনীতিবিদ কি তথ্য পেতে চাইছিলেন? তাঁদের উদ্দেশ্যই বা কি ছিল? এটা জানার আগে সাম্প্রতিক অতীতের অর্থনীতির চলনের ইতিহাসটা জানা প্রয়োজন।

গত শতকের প্রথমার্ধে বিশ্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একে একে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের সমাপ্তি ঘটায় পৃথিবীর একটি বড় অংশ চিহ্নিত হল অনুন্নত বলে। সেই অনুন্নত সদ্য স্বাধীন দেশগুলি চাইল অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিয়ে উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ হওয়ার। অর্থনীতির গবেষকরা বললেন উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির উন্নতি ও উন্নয়নের ব্যাখ্যা যে-তত্ত্বসমূহে পাওয়া যায়, সেগুলি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলির সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তাঁরা স্বল্পোন্নত দেশগুলির জন্য মূলস্রোতের অর্থনীতি থেকে ভিন্ন এক নতুন তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করলেন। এল উন্নয়ন অর্থনীতি। গত শতকের পঞ্চাশ থেকে আশির দশক অবধি এই নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। একসময় কল্যাণমূলক অর্থনীতি ও উন্নয়ন অর্থনীতি প্রায় সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। এই অর্থনীতিতে পঞ্চাশ থেকে আশির দশকে অনেক দেশে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, উৎপাদনের উপাদানের বড় অংশের সরকারি মালিকানা, দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের বহুক্ষেত্রে সরকারের সক্রিয় ভূমিকা এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু আশির দশকে সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক শাসনের পতনে, মূলস্রোতের বা বাজার নির্ভর অর্থনীতিই স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের সমস্যার সমাধান করবে ভাবা হল। কিন্তু এটি স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে দ্রুতহারে দারিদ্র বেকারত্ব অপুষ্টি অনাহার ইত্যাদি বাড়িয়ে দিল এবং সাথে সাথে জরুরি সেবা যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির প্রয়োজনানুগ কাঠামো ও বিস্তৃত ব্যবস্থা গড়ে উঠল না। সুতরাং একবিংশ শতকেও উন্নয়ন অর্থনীতির গবেষণার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত হল।

উন্নয়ন বা কল্যাণমূলক অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য দারিদ্র্য দূরীকরণ। অর্থশাস্ত্রের সামনে আসল সমস্যা হল, দারিদ্র্য কেন এতদিন ধরে যাই যাই করেও যাচ্ছে না, তাঁর উত্তর খুঁজে বের করা। দুই বা তিন দশক আগে অর্থনীতিবিদরা ছোটখাট অঞ্চল বা দেশ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁরা বড় ছবি দেখতে চাইতেন। বিরাট দেশ বা অঞ্চলের সামগ্রিক তথ্য বা ছবি। এর ভিত্তিতে তাঁরা রচনা করবেন উন্নয়নের নানা তত্ত্ব। তাঁদের চাই নানাবিধ পরিবর্তনশীল তথ্য। এরা ম্যাক্রো অর্থনীতিবিদ।

নোবেল বিজয়ী ত্রয়ী এদের বিপরীতে ভাবনা শুরু করেন। মাইকেল ক্রেমারের পর অভিজিৎ ও ডাফলো হাভার্ডের অল্প দূরত্বে এমআইটি-তে একই পথে যাত্রা শুরু করেন। উন্নয়ন ও দারিদ্র্য মোচনের বৃহদাকার প্রশ্নগুলি তাঁরা ছোট ছোট ভাগ করে নেন। ২০০৩ সালে অভিজিৎ ও ডাফলো বিভিন্ন পরীক্ষাগুলি চালিয়ে নিতে গড়ে তোলেন আবদুল লতিফ জামিল পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব (জে-প্যাল), যেখানে চারশো অর্থনীতিবিদ কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করা যেখানে সরকারের যে নীতিগত হস্তক্ষেপে দারিদ্র্য দূরীকরণ করার চেষ্টা হবে, তার কতটা কার্যকর হল সেটি প্রমাণ করা সম্ভব হবে। তাদের গবেষণা না শুধু যে গরিবের জীবনের দুরাবস্থার নানা আঙ্গিক তুলে ধরে তাই নয়, তাকে কোন পদ্ধতিতে ভাল রাখা যায়, প্রমাণ দিয়ে তার পথও দেখায়। পরীক্ষা পরীক্ষা পরীক্ষা। অভিজিৎ তার বই 'পুওর' ইকনমিক্স থেকে 'গুড' ইকনমিক্স—সব জায়গায় বলেন গরিব মানুষের কল্যাণ করার জন্য কোনও পূর্বনির্ধারিত সুসমাচার নেই। পরীক্ষামূলক নানা নতুন পদ্ধতি দিয়ে তা করতে হয়। গবেষণা মানেই বড়সড় তত্ত্বের প্রয়োজন—তা মানেন না অভিজিৎ। বিশ্বাস, যা প্রশ্ন তোলার অধিকারকে অস্বীকার করে—তাকেও মানেন না। অভিজিৎ মানুষের দারিদ্র্য কিভাবে দূর করা যায় তারই পরীক্ষামূলক পদ্ধতি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। একটা কাজে না লাগলে অন্যটা লাগবে—এভাবেই চলতে চান তিনি।

জানতে ইচ্ছে করে, তার এই পরীক্ষামূলক কাজের ধরন কিরকম ছিল। এ ব্যাপারে আরেকজন, ডা: অভিজিৎ চৌধুরী ২০০৭ সাল থেকে বীরভূম জেলায় গ্রামীন স্বাস্থ্য পরিষেবকদের (প্রচলিত 'কোয়াক') প্রশিক্ষণ উন্নয়নে নোবেল জয়ী অভিজিৎ-এর সঙ্গে একসাথে কাজ করেন। তার কথায়, "আমরা দিই প্রশিক্ষণ, জে প্যাল-এর কর্মীরা করে চলেন ভালমন্দের হিসেব-নিকেশ। পদ্ধতি RCT। জে প্যাল থেকে ঠিক করে দেওয়া ১০২ জন প্রশিক্ষিত হতে থাকলেন ন-মাস ধরে। আর অন্য ১০২ জনকে প্রশিক্ষণের আওতার বাইরে রাখা হল। লক্ষ্য, প্রশিক্ষণ দেওয়ার ফলে কাজের জায়গায় এদের ভুল করার প্রবণতা কমে কি না, আর ঠিক কাজ করার সক্ষমতা বাড়ে কি না, তা দেখা। সমানভাবে উত্তেজক ছিল মাপার পদ্ধতি। একদল মানুষকে রোগী হিসাবে অভিনয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। ১৮০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হল গ্রামে গ্রামে ঘুরে পূর্বনির্ধারিত চেক লিস্ট অনুযায়ী কে কেমন কাজ করছে বোঝার জন্য। প্রশিক্ষকরা জানেন না তাদের কখন 'গেরিলা রোগী' আক্রমণ করছে। যাঁরা হিসাব করছেন, তাঁরা জানেন না প্রশিক্ষণ শিবিরে কী পড়ানো হচ্ছে। সকলে সকলের সঙ্গে দেওয়াল তুলে নিজের নিজের কাজটা করছে। ন-মাস প্রশিক্ষণের পর হিসেব-নিকেশের পালা। এক বছরের মাথায় দেখা গেল, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা নিয়ম মেনে কাজ করার দিকে ঝুঁকছে অনেক বেশি।"

জন্ম যদিও বোম্বে কিন্তু কলকাতায় অভিজিতের গড়ে ওঠার পরিবেশ অভিজিৎকে দারিদ্র্য নিয়ে গবেষণায় অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রয়াত পিতা দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই স্বনামধন্য অর্থনীতির অধ্যাপক। সাউথ পয়েন্টের ছাত্র অভিজিৎ অর্থনীতি নিয়ে পড়েছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। তারপর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে। পিএইচ ডি করেছেন হার্ভার্ডে, আর এক নোবেলজয়ী এরিক ম্যাসকিনের তত্ত্বাবধানে। বর্তমানে এমআইটি-র 'ফোর্ড ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল প্রফেসর অব ইকনমিক্স'। কিন্তু তার উচ্চাসন তার শিকড়কে ত্যাগ করেনি। কলকাতায় মহানির্বাণ রোডের বাড়িতেই তার বেড়ে ওঠা। বাড়ির পাশে বস্তির মধ্যকার দারিদ্র্যকে

তিনি দেখেছেন। সেই ছোটবেলায় কাছ থেকে দেখা দারিদ্র্য তাকে শিখিয়েছিল গরিবরাও আর পাঁচজন মানুষের মতোই। তাদের চিন্তাভাবনা আবেগ সব কিছুই অন্যদের থেকে আলাদা নয়। অভিজিতের কাজের পরিধি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য ইত্যাদি সকল বিষয়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, আফ্রিকা, চিন, ভারত, ভারতের রাজস্থান, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গের সকল জায়গায় তার কাজের বিস্তৃতি।

আরেকজন নোবেলজয়ী মাইকেল রবার্ট ক্রেমার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গেটস প্রফেসর অব ডেভেলপিং সোসাইটিজ। উন্নয়ন অর্থনীতির গবেষণায় অগ্রণী গবেষক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনসাস প্রদেশে বড় হয়েছেন ক্রেমার। উচ্চশিক্ষা হার্ভাডে। কেনিয়া, দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র্য গ্রামগুলি তাঁর কর্মক্ষেত্র। কাজ করেছেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও জল সরবরাহ বিষয়গুলিতে। এইসব ক্ষেত্রে সরকারি নীতি কী হওয়া উচিত, তা নির্ধারণ করার জন্য পরীক্ষামূলক অর্থনীতি প্রয়োগ করেছেন ক্রেমার।

অভিজিৎ ও ক্রেমার-এর সঙ্গেই নোবেল পেলেন এস্থার ডাফলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-র (এমআইটি) অধ্যাপক এবং অভিজিতের সঙ্গে জে-প্যাল এর যুগ্ম-প্রতিষ্ঠাতা। ৪৬ বছর বয়সি ডাফলো অর্থনীতিতে সর্বকনিষ্ঠ নোবেলজয়ী। ক্ষুরধার মেধার জন্য ও ফিল্ড রিসার্চে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য সকলেই তাকে সম্মান করেন। তথ্য-পরিসংখ্যান সংগ্রহে যেমন তাঁর নিষ্ঠা, তেমনই পরিশ্রম করার ক্ষমতা। বীরভূম ও উদয়পুরের পঞ্চায়েতে মহিলা প্রধানদের সিদ্ধান্ত-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন এস্থার-রাঘবেন্দ্র। আরসিটি পদ্ধতির প্রতিষ্ঠায় একটি দিকনির্ণায়ক কাজ। তাঁর অধিকাংশ কাজই ভারতকে নিয়ে। ঘটনাক্রমে অভিজিত-ডাফলো স্বামী স্ত্রী।

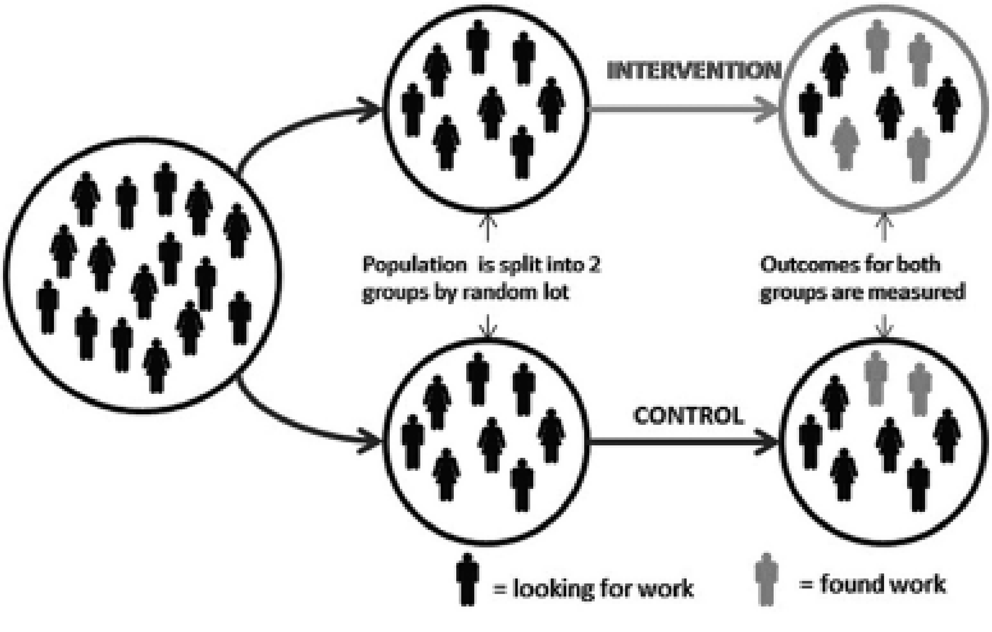

একটি আরসিটি পদ্ধতি

কিন্তু এই নোবেলজয়ী ত্রয়ীর কাজের প্রথম দিকে আরসিটি পদ্ধতিকে গোঁড়া অর্থনীতিবিদরা ভালো ভাবে নেননি। বিস্তর সমালোচনা হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। ২০১৮ সালে, উন্নয়ন অর্থনীতির পনেরোজন গবেষক 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকায় 'Buzzwords and tortuous impact studies won't fix a broken aid system' শিরোনামে একটি খোলা চিঠিতে এঁদের পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁদের মূল বক্তব্য—ক) দারিদ্র্য এবং তার প্রকৃতি মূলত অনুন্নত দেশগুলির আর্থসামাজিক কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের (আয়, সম্পদ, লিঙ্গ এবং জাতপাত-ভিত্তিক বৈষম্য) সঙ্গে সম্পর্কিত। মূল কাঠামোগত পরিবর্তন না-হলে এই বৈষম্য এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব নয়। খ) এই গবেষণাগুলি মূলত স্বল্পকালীন লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। গ) পরীক্ষাগুলি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ঘ) মানুষকে গিনিপিগের মত ব্যবহার অনৈতিক। ঙ) গবেষকের পূর্বানুমান পরিকল্পনা ও প্রয়োগকে প্রভাবিত করে। চ) কিন্তু এর প্রয়োগ করবেন সরকার ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়। ছ) অভিজিৎরা দাবি করেন, ব্যষ্টিগত চরিত্র সমষ্টিগত চরিত্রের প্রভাবাধীন নয়। সেক্ষেত্রে ব্যষ্টির যোগফলই সমষ্টি। এই উপসংহার ঐতিহাসিক বাস্তব ও তাত্ত্বিক বিচারে ভ্রান্ত। জ) এই প্রবণতা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ। ঝ) গবেষণাগুলির ফলাফল পরোক্ষে বেসরকারিকরণ। ঞ) চলতি বাজার অর্থনীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন না-তুলে এবং এই অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান খুঁজতে চেয়েছেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু বিভিন্ন দেশের সরকার এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং সফলও হয়েছেন। এই যেমন, আপনি যদি চান দরিদ্র্যরা কৃমিনাশক ওষুধ বা ম্যালেরিয়ারোধী ওষুধ ব্যবহার করুক যাতে তারা ঐ রোগ থেকে মুক্তি পায়, আপনি কি চাইবেন তারা তা কিনে ব্যবহার করবেন? অথবা আপনি তাঁদের বিনে পয়সায় দেবেন? অনেকদিন ধরে অর্থনীতিবিদরা ভাবতেন দরিদ্রদের জন্য অল্প হলেও ওষুধের বিনিময় মূল্য রাখা উচিত যাতে ওষুধের কার্যকারিতার মূল্য তাঁরা বুঝতে পারেন। কিন্তু এই ত্রয়ী অর্থনীতিবিদদের গবেষণায় দেখা গেছে ভর্তুকি ওষুধের ব্যবহার অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত WHO এবং UN-কে ভর্তুকিকে অগ্রাধিকার দিতে সাহায্য করেছে। 'নোবেল লেকচার্স'-এর মঞ্চে অভিজিৎ তাঁর কার্যপদ্ধতির ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন,

'প্রচলিত অর্থনীতিবিদদের ধারণা দরিদ্রকে টাকা দিলে তিনি কর্মক্ষমতা হারান। কিন্তু এই কথা কি আদৌ অর্থনীতি-সিদ্ধ?' তাঁরা দেখার চেষ্টা করেছেন যে—দরিদ্রদের টাকা দিলে তাঁরা অলস হয়ে পড়ছেন কি না। তাঁরা দেখলেন কাউকে টাকা দেওয়া হলে তিনি অলস হয়ে পড়বেন, এই তত্ত্বের কোনও ভিত্তি নেই।

তাই গভীর পর্যালোচনার পর নোবেল কমিটি তাদের হাতে মহার্ঘ নোবেল পুরস্কার তুলে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে নোবেল কমিটি ঘোষণা করছেন, 'এই বছরের নোবেল প্রাপকদের গবেষণা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। কেবলমাত্র দুই দশকে তাঁদের পরীক্ষানির্ভর গবেষণা পদ্ধতি উন্নয়ন অর্থনীতির ভোল বদলে দিয়েছে। উন্নয়ন অর্থনীতি এখন গবেষণার এক সমৃদ্ধশালী ক্ষেত্র।'

নোবেল কমিটির এই পর্যালোচনা বা স্বীকৃতির খবরে অভিজিৎ বলেছিলেন, 'এটা খুবই ভালো হল যে, যে পদ্ধতিতে আমরা কাজ করছি তা স্বীকৃতি পেল, প্রতিষ্ঠা পেল। যখন শুরু করেছিলাম, বারবার শুনতে হয়েছে, এটা কি অর্থনীতি? এখন আমাদের আরসিটি অর্থনীতির একেবারে কেন্দ্রে। এটা একটা জয়ের মুহূর্ত।'

প্রসঙ্গক্রমে অভিজিৎ ও ডাফলোর নতুন বই 'গুড ইকনমিক্স ফর হার্ড টাইমস'-এর সম্পর্কে বলতে গিয়ে অভিজিৎ বলেন বইটিতে অর্থনীতিকে একট উপযোগীবিদ্যা হিসাবে দেখান হয়েছে। তিনি বলছেন—'বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদ দেববানীর মতো করে কথা বলেন। আমরা তা করিনি, করি না। আমরা যুক্তি দিই, আমরা চাই লোকে আমাদের যুক্তিগুলো শুনুক, বিচার করুক, বোঝার চেষ্টা করুক। কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। এর মানে হল, তাদের সর্বদাই একটা স্বাধীনতা আছে এই কথা বলার যে—আপনি বলছেন বটে কিন্তু তথ্যপ্রমাণ তো অন্য কথা বলছে।'

আসলে অভিজিৎ চেয়ারে ঠান্ডা ঘরে বসে নয়, মানুষের পাশে বসে, মানুষের জীবনের কথা শোনে ছাত্রের মত। মানুষকে পূর্ণ সক্ষমতায় কথা বলার মানসিকতা দেয়। পর্যবেক্ষণ করে গোয়েন্দার মত, তা থেকে তথ্য তুলে আনেন। তিনি যেমন বলেন, 'প্রশ্ন তোলো বারবার, উত্তর খোঁজো, তর্ক করো। আর তারপর সিদ্ধান্তে এসো। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটাই পৃথিবীতে 'সর্বোত্তম'—এই ভাবনায় তাড়িত না হয়ে নতুন ভাবনায় জারিত হও।

কোথায় যেন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার ঝঙ্কার অনুরণন হল।

সূত্র : দেশ ও দৈনিক সংবাদপত্র

প্রচ্ছদ কথা-৪

তপন দাস

বিকল্প শক্তির আঁতুরঘর

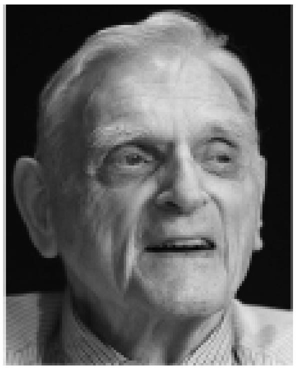
জন বি গুডেনাফ

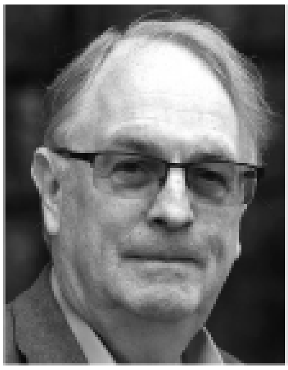
এম স্ট্যানলী হুইটিংহাম

আকিরা ইউশিনো

আড্ডার মেজাজে স্নেহাশিসদার কৌতূহলী প্রশ্নের যেন অন্ত নেই। এই যেমন সেদিন প্রশ্ন করল ব্যাটারির উত্থান নিয়ে। সত্যিই তো আমরা যেমন গাড়িতে বা ইনভার্টারের বড় ব্যাটারি দেখে অভ্যস্ত ঠিক তেমনি মোবাইল বা ল্যাপটপে ব্যবহৃত ছোট ব্যাটারিও দেখছি। ব্যাটারির এই ক্রমশ উন্নয়ন কারা ঘটালেন। আসলে এই ব্যাটারির আবিষ্কারও অনেকটা ম্যারাথন দৌড়ের মত। একজন তার অংশটুকু দৌড়ে ব্যাটন তুলে দিয়েছেন আরেকজনের হাতে। লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্রস্তুতিতে যে তিনজন বিশেষ ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তারা ২০১৯-এ রসায়নের নোবেল বিজয়ী জন বি গুডেনাফ, এম স্ট্যানলী হুইটিংহাম ও আকিরা ইউশিনো।

একদিকে নগরায়ন ও অন্যদিকে শিল্পায়নের জেরে মানুষ যখন বুঝতে শুরু করল জীবাশ্ম জ্বালানির সংকটের কথা, থেমে থাকল না বিজ্ঞানীরাও। তারাও নেমে পড়েছেন বিকল্প শক্তির সন্ধানে। খুব সচেতন ভাবেই জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা থেকে মুক্তির পথ সর্বপ্রথম দেখিয়েছেন এম স্ট্যানলী হুইটিংহাম। অপেক্ষাকৃত হাল্কা জলে ভাসমান লিথিয়াম ধাতু দিয়ে তৈরি করেন এই ব্যাটারি। বিংহামটোন বিশ্ব- বিদ্যালয়ের ডিরেক্টর ও রসায়নের অধ্যাপক হুইটিংহামের জন্ম ১৯৪১-এর ২২শে ডিসেম্বর। রবার্ট হাগিন্সের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন অক্সাইডের উপর গবেষণা করলেও পরবর্তীতে তিনিই লিথিয়াম ব্যাটারির অনেকটা উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়েছেন। ৭০ এর দশকের শেষের দিকে তিনিই ইন্টারকেলেশান তড়িৎদ্বারের আবিষ্কার করেন। পুনঃনবিকরণযোগ্য ব্যাটারির ক্ষেত্রে এই ধরনের তড়িৎদ্বারের ব্যবহার অপরিহার্য। এই ব্যাটারিতে

একদিকে যেমন প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করে রাখা যায় আবার তাকে পুনরায় তড়িতাহিতও করা সহজ। লিথিয়াম ব্যাটারির এই উদ্ভাবক পিতা ইন্টারকেলেশান তড়িৎদ্বার বানাতে টাইটেনিয়াম ডাই সালফাইডের ক্যাথোড, লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অ্যানোড রূপে ব্যবহার করেছেন। অনেকে মজার ছলে বলেন এ যেন স্যান্ড উইচে একটুখানি জ্যাম দেওয়া। এই ব্যাটারিতে জ্যামের কাজটা করে লিথিয়াম আয়ন। হুইটিংহাম এখানে লিথিয়ামের সাথে পরিবর্তনশীল জারনস্তর সম্পন্ন ভ্যানাডিয়ামের যৌগও ব্যবহার করেছেন। ২০১০ সালে অ্যামিরিকান কেমিক্যেল সোসাইটির প্রদেয় time contribution সম্মান সহ একাধিক পুরস্কার তিনি পেয়েছেন তার অনবদ্য আবিষ্কারের জন্যে।

অপেক্ষাকৃত ভঙ্গুর এই লিথিয়াম ব্যাটারিকে আরও উন্নত করার দায়িত্ব নিলেন জন বি গুডেনাফ। অ্যামেরিকান পিতামাতার প্রথম সন্তান গুডেনাফ ১৯২২-এর ২৫শে জুলাই জার্মানির জেনাতে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইয়ালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পরই তিনি ইউ এস মিলিটারির আবহাওয়া দপ্তরে নিজেকে যুক্ত করলেও খুব অল্প সময় বাদেই ফিরে এসে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্লারেন্স জেনারের তত্ত্বাবধানে পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। হেক্সাগোনাল ঘনসন্নিবেশ ছিল তার গবেষণার বিষয়। পরবর্তীতে এম আই টি লিঙ্কন ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কাজ আরও একধাপ এগিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগদান করেন। ১৯৮৬-তে যোগদান করেন অস্টিনের স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। ৪ ভোল্টের ব্যাটারিটি বানাতে গুডেনাফ লিথিয়ামের পরিবর্তে অন্য ধাতু ব্যবহার করেছেন। নোবেল বিজয়ীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বয়সে নোবেল জয়ী গুডেনাফ লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির উন্নতি সাধন ছাড়াও গুডেনাফ-কানামোরি নিয়ম কম্পিউটারের র‍্যান্ডম অ্যাক্সিস মেমোরির উন্নতি সাধনে বিশেষ অবদান রেখেছেন। বিজ্ঞানের জগতের এই দিকপাল ব্যক্তি ছিনিয়ে নিতে পেরেছেন এনরিকো ফার্মি পুরস্কার (২০০৯), ন্যাশানাল মেডাল অব সাইন্স (২০১১) ও কোপলে মেডালের মত একাধিক সম্মানীয় পুরস্কার।

অতি সক্রিয় লিথিয়ামের ব্যাটারিকে কিভাবে আরও নিরাপদে ব্যবহার করা যায়, এ নিয়ে গুডেনাফের পরে যিনি ভেবেছেন তিনি হলেন জাপানি রসায়নবিদ আকিরা ইয়োশিনো। ইয়োশিনো কার্বনজাত এক বিশেষ পদার্থের মধ্যে একে রাখার ব্যবস্থা করেন। এই উন্নত মানের ব্যাটারি সৌরশক্তি বা বায়ুপ্রবাহ থেকে প্রাপ্ত শক্তিকেও সঞ্চিত রাখতে সক্ষম। ৭১ বছর বয়সী আকিরার জন্ম ১৯৪৮-এর ৩০শে জানুয়ারি। ওসাকা শহরে বেড়ে ওঠা আকিরার মাস্টার ডিগ্রি কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পরবর্তীতে তড়িৎ রসায়নে পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। রসায়নে এশিয়ার প্রথম নোবেল জয়ী আকিরা বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ফুকুই-এর ক্লাসও করেছেন। ১৯৮১ সালে পলিঅ্যাসিটিলিনকে কাজে লাগিয়ে পুনঃনবিকরণযোগ্য ব্যাটারি বানাতে সক্ষম হলেও এই ব্যাটারি আয়তনে অনেকটা বড় হওয়ায় এটি বাণিজ্যিক ভাবে অতটা সুফল লাভ করেনি। কিন্তু তিনিই প্রথম লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইডের ব্যাটারিকে ফেব্রিকেট করেছেন। তার আবিষ্কৃত কার্বনজাত পদার্থ অ্যানোড রূপে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি সক্রিয়তা অনেকটাই বৃদ্ধি পায় এবং এটি ব্যবহার অনেক গুণ বেশি নিরাপদ। আকিরার এই গবেষণা টোকিওর আসাহি কর্পোরেশন ও নাগোয়ার মেইজো বিশ্ববিদ্যালয়। সোনি কোম্পানি ১৯৯১ সালে বাণিজ্যিক ভাবে এই লিথিয়াম ব্যাটারি বাজারে নিয়ে আসে। আজ প্রায় সব কোম্পানি মোবাইল, ল্যাপটপে বা ক্যামেরায় এই ব্যাটারি ব্যবহার করছে। এই তিন বিজ্ঞানীর কীর্তি মানবসমাজকে এক নতুন দিশা দেখিয়েছে। তাদের ভাবনার নমনীয়তা ও কঠিন অধ্যাবসায় বিজ্ঞানকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। যেখানে ৯৭ বছর বয়সী গুডেনাফকে তার বয়সের ভার দমিয়ে দিতে পারেনি।

LITHIUM-ION RECHARGEABLE BATTERY: DISCHARGE MECHANISM

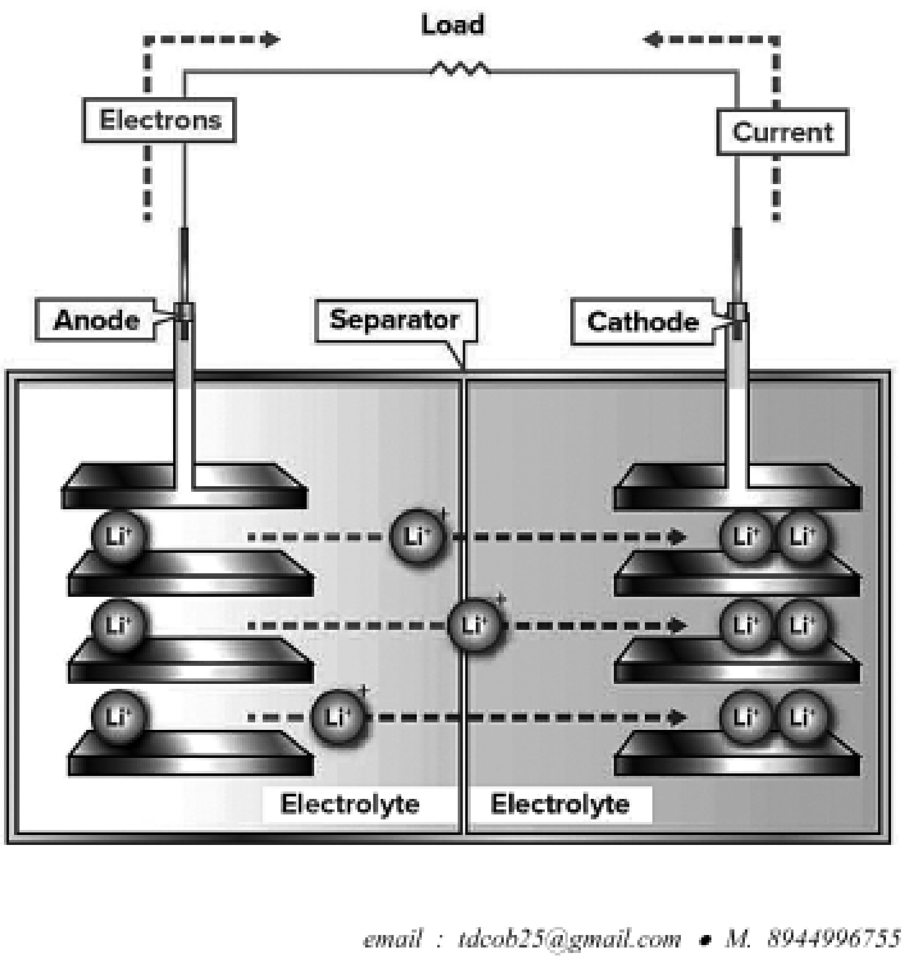

email : tdcob25@gmail.com • M. 8944996755

প্রণব নাথ চক্রবর্তী

গাছের প্রাণ

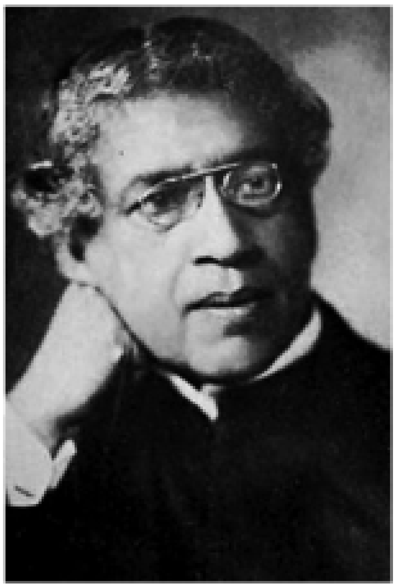

কিছুদিন আগে, ক্লাস ফোরের এক ছাত্রকে, প্রশ্ন করেছিলাম, বলত জগদীশচন্দ্র বসু কে ছিলেন? ছেলেটি বলল, উনি একজন মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। গাছেদেরও প্রাণ আছে, এই আবিষ্কার করে, উনি বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন।

ছেলেটিকে বললাম, তবে তো জগদীশ বসুর আগে, চাষিরা জানতই না যে, গাছেদের প্রাণ আছে। সেই সময় চাষিরা নিশ্চই, গাছের বাঁচা আর গাছের মরে যাওয়া নিয়ে কিছু বলত না।

ছেলেটি বলল তা হবে কেন, হাজার বছর আগেও, চাষিরা এক ঝলক তাকিয়েই, বুঝতে পারত, কোন গাছটা জ্যান্ত, আর কোন গাছটা মরা। কেমন করে বুনো গাছকে মারা যায়, আর ভাল গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাও তারা জানত।

আমি বললাম, তার মানে চাষিরা আগেই জানত, গাছেরা জীবন্ত। তাহলে জগদীশ বসু এমনকি আবিষ্কার করেছিলেন, যা চাষিরা আগে জানত না?

এবার ছেলেটি একটু চিন্তা করে বলল, অতশত জানিনা, তবে যা বলেছি, ঠিক বলেছি। স্কুলের পরীক্ষায় ঐ কথা লিখে, আমি ফুল মার্কস পেয়েছি।

পরে আমি বেশ কিছু লোককে, এই একই প্রশ্ন করেছি। তাদের অনেকেই, ঐ ছেলেটির মতন, একই উত্তর দিয়েছেন। তারা বুঝেছেন, কোথাও একটা গলদ হচ্ছে। কিন্তু কোথায় সেই গলদ, তা তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি।

তারা বলেছেন, গাছেদের বাঁচা মরা, ঠিক প্রাণীদের বাঁচার মরার মত নয়। চাষিরা জানে, যে একটা গাছকে কেটে টুকরো টুকরো করে মাটিতে পুঁতলে, অনেক কলমের গাছ জন্মায়। কিন্তু একটা প্রাণীকে, কেটে টুকরো করা মাত্রই, তার প্রাণবায়ু ফুরুৎ। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, গাছেদের প্রাণ দু-নম্বরী প্রাণ। গাছের প্রাণ, ইচ্ছেমতন ভাগ করা যায়।

তাদের দোষ নেই, জগদীশ বসুর গবেষণা নিয়ে, পড়াশোনা করার সময় বা সুযোগ, তাদের ঠিকমত হয়নি। জগদীশ বসুর গবেষণা নিয়ে, অল্প কিছু লিখছি।

জগদীশ বসু, গাছ আর প্রাণীর মধ্যে কি কি মিল আর অমিল আছে, তা জানার জন্য, বহু গবেষণা করেছেন। এই গবেষণার অনেক অংশই, তিনি বিদেশে গিয়ে নিজের হাতে তৈরি, উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রদর্শন করেন। এইসব গবেষণা আর আবিষ্কারের ফলে উনি নিজেকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার অনেক গবেষণাই ব্রিটেনের রয়্যাল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল।

ওনার আবিষ্কার গাছ আর প্রাণীদের প্রাণের মাঝে, এক যোগসূত্র রচনা করছে। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, প্রাণী আর গাছের মাঝে সঠিক কোন সীমারেখা নেই। যেইসব আবিষ্কার করে উনি গাছ আর প্রাণীর মধ্যে, মিল খুঁজে পেয়েছেন, তার কয়েকটির কথা এখানে উল্লেখ করছি।

১) গাছেদের অনুভূতি আর উত্তেজনায় সাড়া (মনে হয় যেন প্রাণীর দেহের সাড়া)

২) গাছের এক অংশ থেকে অন্য অংশে উত্তেজনা প্রবাহ (ঠিক যেন প্রাণী দেহের নার্ভ)

৩) গাছের দেহের স্বতঃস্পন্দন (ঠিক যেন প্রাণী দেহের হার্ট)

৪। গাছেদের পরিশ্রমে ক্লান্ত হওয়া আর বিশ্রামে স্বাভাবিক হওয়া (ঠিক যেন প্রাণীর দেহ)

৫) গাছেদের শরীরে বিষ প্রয়োগ আর ওষুধ প্রয়োগের ফল (একেবারে প্রাণী দেহের মত)

গাছ আর প্রাণীর মাঝের সীমারেখা খুঁজতে গিয়ে তিনি নির্জীব ধাতুখন্ড অবধি পৌঁছে গেলেন। তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন যে, প্রাণী, গাছ আর নির্জীব ধাতুর মধ্যে সঠিক কোন সীমারেখা নেই।

প্রাণীর শেষ আর গাছের আরম্ভ মিশে গেছে। গাছের শেষ আর ধাতুর আরম্ভও মিশে আছে। তার এই যুগান্তকারী আবিষ্কার, সমস্ত বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল। প্রথমে অনেকেই এই আবিষ্কারের বিরোধিতা করলেও শেষ অবধি সকলেই মানতে বাধ্য হয়েছিল।

এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা, জগদীশচন্দ্র বসুর একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

৮ই নভেম্বর ১৯০১

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this string. www.print-driver.com

Royal Institution of Great Britain

বন্ধু,

কতদিন হইল আমার এক বক্তৃতার সময় বলিয়াছিলাম যে—There is absolutely a continuity of phenomena, starting from the animal tissue, passing through the transitional vegetable, to the inorganic metal. You cannot draw a dividing line.

তোমার জগদীশ

প্রায় একশো কুড়ি বছর আগে, জগদীশচন্দ্র বসু বলেছিলেন, আমরা জড়, উদ্ভিদ আর প্রাণীর মধ্যে কোন বিভাজন রেখা টানতে পারি না। এই কথাটা যে কত সত্যি, আজকের দিনে আমরা সবাই জানি। অতি ক্ষুদ্র জীবাণুদের জগতে আমরা অনেক উদাহরণ পাই। জীবাণুরা, অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, না অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ? সেই খোঁজ করলে আমরা তিন রকম উত্তর পাই। কিছু জীবাণু অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, কিছু জীবাণু অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ আর কিছু জীবাণু না উদ্ভিদ না প্রাণী। এরা আধা প্রাণী আর আধা উদ্ভিদ। এরপর আমরা উদ্ভিদ আর প্রাণীর মধ্যে সঠিক কোন বিভাজন রেখা টানব কেমন করে?

ভাইরাস (Virus) জীবাণুর থেকেও ছোট। এদের জগতে জড় আর জীবনকে আলাদা করা শক্ত। ভাইরাস কখনও জীবন্ত কখনও জড়। এদের কোন বৃদ্ধি নেই, এরা নিজে নিজে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। বিশেষ কোন গাছের বা প্রাণীর জীবন্ত কোষ, বিশেষ কোন ভাইরাসের বংশ বিস্তার ঘটায়।

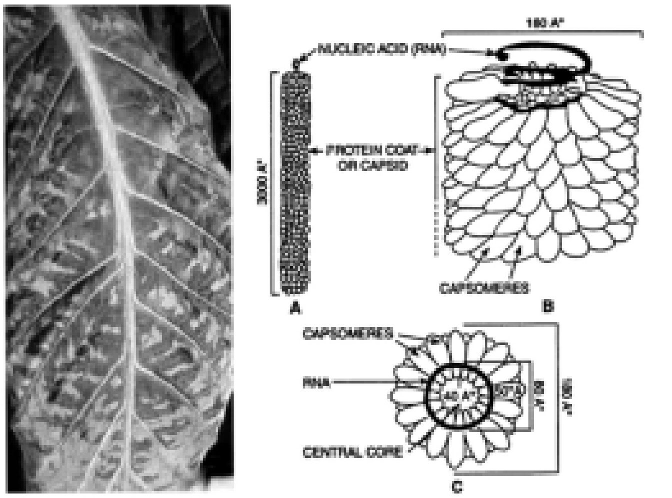

FIG. 13.20. Tobacco mosaic virus (TMV). A. surface view; B. an enlarged portion showing RNA-capsomere arrangement. C. view in section.

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। টোবাকো মোজেক ভাইরাস, জমা করলে সেইটা নুনের মত, এক ক্রিস্টাল তৈরি হবে। এইটা একেবারেই জড় পদার্থ। এইটা মানুষের গায়ে মাখলেও কিছু হবে না। ক্রিস্টাল জড়ই থেকে যাবে। কিন্তু যদি এই ক্রিস্টাল, কোন তামাক গাছের পাতায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ঐ ক্রিস্টাল চূর্ণ তামাক পাতার কোষের ভেতরে পৌঁছে যাবে। তখন ঐ তামাক পাতার অসুস্থ কোষ নিজেই ভাইরাস তৈরি করা শুরু করবে। ফলে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি ঘটবে। তামাক গাছে এই ভাইরাস জীবন্ত। ঐ তামাক গাছ অসুস্থ হয়ে যাবে। পাতায় ছোপ ছোপ দাগ ধরবে।

চাষারা বলবে এই গাছটায় রোগ ধরেছে। গাছটাকে উপড়ে, পুড়িয়ে দিতে হবে, নইলে পরে ক্ষেত্রে সব গাছ নষ্ট হবে। অথচ গাছের বাইরে আনলেই ভাইরাসকে জড় মনে হবে।

অনেকেই বলবেন ঐ ক্রিস্টালকে জড় বলা ঠিক হবে না। এর ভেতরে Vital Force বা প্রাণশক্তি সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। এই প্রাণশক্তি না থাকলে অজৈব থেকে জৈব পাওয়া সম্ভব নয়। প্রাণশক্তির প্রভাব না থাকলে কোনভাবেই অজৈব বস্তু থেকে জৈব উপাদান পাওয়া সম্ভব নয়।

জার্মান পণ্ডিত Friedrich Wohler 1822 সালে এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। সম্পূর্ণ অজৈব বস্তুর দিয়েই তিনি জৈব বস্তু (Urea), তৈরি করতে সক্ষম হন। এইজন্য কোন Vital Force লাগেনি। জগদীশচন্দ্র বসু সঠিক কথাই বলেছেন, জীব আর জড়ের মাঝে কোন বিভেদ রেখা টানা যায় না।

গাছপালা নিয়ে গবেষণার জন্য উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন এবং অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির দরকার হয়। অথচ তখন পৃথিবীতে এই জাতীয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়নি। জগদীশ বসু নিজেই ঐসব সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরি করেন। তাঁর তৈরি নানা যন্ত্র, সেই যুগের বিস্ময়। তাঁর তৈরি একটা সরল অথচ অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র আর সেই যন্ত্রের ব্যবহার নিয়ে অল্প কিছু লিখছি।

কী পরিমাণ আলোতে গাছেদের ওজন কতটা বৃদ্ধি হয়? গাছের ওজন বৃদ্ধিতে, আলোর রঙের ভূমিকা কতটা, এইসব মাপার জন্য যন্ত্র চাই। এ কাজ দাঁড়িপাল্লার কর্ম নয়, নতুন যন্ত্র চাই। গাছ যতটা জল শোষণ করে তার অতি অল্প অংশই গাছের শরীর গঠনের কাজে লাগে। বাকি জল বাষ্পের আকারে বার হয়ে যায়। দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মাপলে গাছের বৃদ্ধি আর শোষিত জল, এই দুয়ের যোগফল পাওয়া যাবে। গাছের আসল বৃদ্ধি আলাদা করে মাপতে পারে এমন যন্ত্র চাই।

গাছেরা মাটি থেকে জল আর বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে আলোর সাহায্যে নিজেদের শরীর গঠন করে। গাছেরা কার্বন ডাই অক্সাইডের অণু আর জলের অণু জোড়া দেবার সময়, তার থেকে কিছু অক্সিজেনের অণু ছেড়ে দেয়। বাকি অংশ দিয়ে গাছের শরীর গঠিত হয়। এই প্রক্রিয়ার মূল উপকরণ আলো, তাই এর নাম ফটোসিন্থেসিস (Photosynthesis)। এই প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড শোষিত হয়, অক্সিজেন তৈরি হয় আর গাছের শরীর গঠন হয়। অর্থাৎ গাছের ওজন বৃদ্ধি পায়।

কতটা কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করলে কতটা অক্সিজেন তৈরি হবে আর তার ফলে ঐ গাছের ওজন কতটা বৃদ্ধি পাবে, সবই অঙ্কের হিসাব। জলের গাছ বাতাস পায় না, তাই জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করেই অক্সিজেন তৈরি করে।

এইসব গুণাগুণের উপর নির্ভর করেই তিনি গাছের ওজন বৃদ্ধির পরিমাণ, মাপার নতুন যন্ত্র তৈরি করলেন। যন্ত্রের প্রাথমিক উপকরণ খুবই কম। একটা কাঁচের বীকার। ঐ বীকারের ভেতরে ঢোকানো যায় সেই মাপের একটা কাঁচের ফানেল, একটা কাঁচের টেস্টটিউব আর একটা স্টপ ওয়াচ।

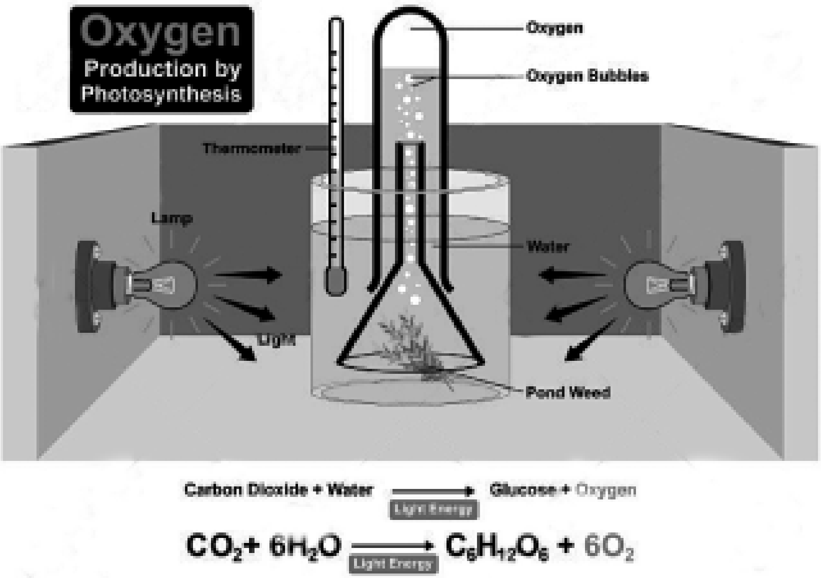

পরীক্ষার জন্য বীকারে জল ভরে তার ভেতর অল্প কিছু জলের তলার ঝাঁঝি গাছ রাখতে হবে। কাঁচের ফানেলটা উলটো করে, ঝাঁঝি চাপা দিতে হবে। যাতে ফানেলের নলটা জলে ডুবে থাকে, সেই পরিমাণ জল দিতে হবে। তারপর একটা জল ভরা টেস্টটিউব ফানেলের নলের উপর উলটো করে চাপা দিতে হবে। এই যন্ত্রটার উপর আলো দিলে কাঁচের ভেতর দিয়ে আলো ঝাঁঝিতে লাগবে, ফলে ফটোসিন্থেসিস চালু হয়ে যাবে। গাছের শরীর গঠিত হবে আর অক্সিজেন ছাড়বে।

এই অক্সিজেনের বুদবুদ, ফানেলের ভেতর দিয়ে টেস্টটিউবে জমা হবে। কত সংখ্যক বুদবুদে কতটা পরিমাণ অক্সিজেন জমা হচ্ছে তার হিসাব করতে হবে। তাহলে প্রতিটি বুদবুদে কতটুকু অক্সিজেন আছে তা জানা যাবে। ঐ পরিমাণ অক্সিজেন ছাড়লে কতটা উদ্ভিদ শরীর গঠিত হয়েছে তার হিসাব করা যাবে। একটা বুদবুদে গাছের ওজন কতটা বাড়ছে, সঠিক ভাবে জানা যাবে।

স্টপওয়াচ দিয়ে দেখতে হবে কত সময়ে কত বুদবুদ উঠছে। তাহলেই কী গতিতে গাছের ওজন বৃদ্ধি হচ্ছে, তা সূক্ষ্মভাবে মাপা যাবে। আর টেস্টটিউবে কতটা অক্সিজেন জমা হয়েছে সেইটা মেপে গাছের মোট ওজন বৃদ্ধি সঠিক ভাবে জানা যাবে।

কত জটিল আর কত সূক্ষ্ম মাপজোপ অথচ কত সহজ যন্ত্র। আলোর তেজ কখনো কম, কখনো বেশি করলে গাছের ওজন বৃদ্ধি কেমন হয়? কোন রঙের আলোতে কতটা বৃদ্ধি হয়? এই রকম হাজারো জটিল মাপ এই যন্ত্রে অনায়াসেই করা যায়।

এই যন্ত্র দিয়েই জগদীশ বসু এক বিশ্ববিখ্যাত আবিষ্কার করেছিলেন। গাছের বৃদ্ধির উপর বৃষ্টির জলের প্রভাব কতটা তা তিনি মেপে দেখান। ঘটনাটা সহজ করে বলার চেষ্টা করছি।

রোদ ঝলমল দুপুরের আকাশে হঠাৎ কালবৈশাখীর মেঘ। তারপর বজ্রবিদ্যুতের ঝলকানি, তারপর ঝমঝম বৃষ্টি। অল্প পরেই আবার রোদ। ঝড়ে বৃষ্টিতে নাকানি চোবানি খেয়ে গাছেদের অবস্থা খুব খারাপ হওয়ার কথা। তার বদলে গাছেদের দেখলে মনে হবে ওরা যেন আরো বেশি তরতাজা হয়েছে।

আকাশের বজ্রবিদ্যুতের ফলে হাওয়ার ভেতর এক অ্যাসিড বাষ্প তৈরি হয়। ঐ বাষ্প বৃষ্টির জলে মিশে যায়। তার ফলে বৃষ্টির জল, অতি হালকা অ্যাসিডে পরিণত হয়।

(Nitrogen + Oxygen+Electric discharge = Nitric oxide) & (Nitric oxide + water = Nitrous acid)

তিনি সন্দেহ করেন বৃষ্টির জলের এই অ্যাসিড গাছেদের ফটোসিন্থেসিস অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। তাই গাছেদের বৃষ্টির পর এত তরতাজা দেখায়। তার সন্দেহ ঠিক না ভুল সেই রহস্য ভেদ করার জন্য পরীক্ষা শুরু হল। জলে নাইট্রাস অ্যাসিড দিলে গাছের ওজন বৃদ্ধির উপর কী প্রভাব পরে, তার খোঁজ শুরু করলেন। এই কাজের জন্য উনি গাছের বৃদ্ধি মাপার এই বুদবুদ যন্ত্র ব্যবহার করলেন।

উনি প্রথমে এই যন্ত্রের জলে অল্প নাইট্রাস অ্যাসিড মেশালেন। ফল একেবারেই উলটো হয়ে গেল। গাছের বৃদ্ধির পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই কমে গেল।

উনি কিন্তু দমলেন না, জল মিশিয়ে অ্যাসিড আরও অনেক পাতলা করলেন। এর ফলে গাছের ওজন বৃদ্ধির হার প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গেল। তবুও তা অ্যাসিডবিহীন জলের তুলনায় কম।

তখন উনি অনেক জল দিয়ে অ্যাসিড আরও পাতলা করলেন। এবার এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। অ্যাসিড যতই পাতলা হচ্ছে গাছের বৃদ্ধির হার ততই হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে। অতি পাতলা অ্যাসিডে গাছের বৃদ্ধির হার স্বাভাবিকের তুলনায় বহু গুণ বেড়ে গেল।

অতি হাল্কা অ্যাসিড গাছের ফটোসিন্থেসিসকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। অথচ অ্যাসিডের মাত্রা যদি অল্প বেশি হয় তাহলে ফটোসিন্থেসিস খুব কমে যায়। তার এই আবিষ্কার বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছিল।

খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে, বৃষ্টির জলে মোটামুটি 0.01 ppm নাইট্রাস অ্যাসিড থাকে। যেখানে গাড়ির দূষণ খুব বেশি, সেইখানে নাইট্রাস অ্যাসিডের মাত্রা 0.2 ppm অবধি (গাড়ির স্পার্ক প্লাগ) উঠে যায়। বেশি অ্যাসিডের ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। তাই হয়ত শহরের ভেতর চাষ করলে ফলন কম হয়।

জগদীশচন্দ্র বসুর কথা বলতে গেলে আর একটা বিশেষ কথা বলা

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
www.print-driver.com

খুবই দরকার। উনি প্রথম জীবনে যেসব আবিষ্কার করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন আর সম্মান লাভ করেন তা কিন্তু গাছপালা নিয়ে নয়। উনি বেতার তরঙ্গের নানা গুণাগুণ আর বেতার তরঙ্গের জন্য ব্যবহৃত নানা যন্ত্র তৈরি করেই বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

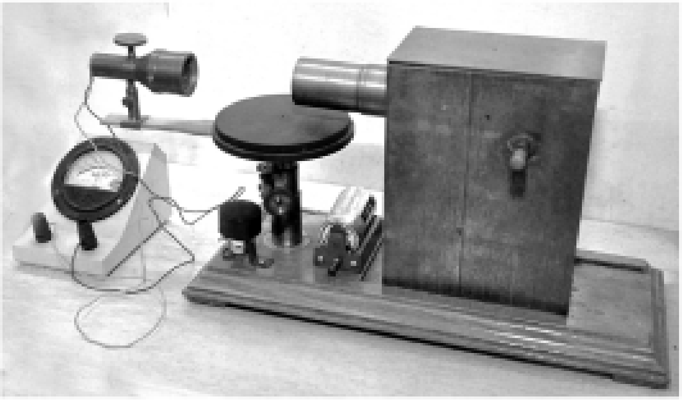

শেষ করার আগে কয়েকটা কথা না বললে এই রচনা অপূর্ণ রয়ে যাবে। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জগদীশ বসুকে বহু বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল। সেই যুগে একজন ভারতীয় নেটিভের পক্ষে ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে গিয়ে ঐ সব দেশের পন্ডিতদের ভুল ধরিয়ে দেওয়া, আর নিজের আবিষ্কারকে তাদের মানতে বাধ্য করা, অতি কঠিন কাজ ছিল।

একজন ইন্ডিয়ান নেটিভ জ্ঞান বিজ্ঞানে তাদের হারিয়ে দেবে, এইটা তারা কল্পনাও করতে পারত না। অনেকে নানা ভাবে জগদীশচন্দ্র বসুকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। একবার ওনার এক আবিষ্কারকে অন্যের আবিষ্কার বলে চালাবার চেষ্টাও হয়েছিল। সেই প্রতিকূল অবস্থার কথা উনি নিজেই লিখে জানিয়েছিলেন। সেই ঘটনার একটু আভাস দিচ্ছি।

লন্ডন থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশ বসুর একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃতি।

লন্ডন, ১লা মে ১৯০২

বন্ধু,

এই যে Royal Society-তে গত বৎসর মে মাসে Plant Response সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম, তাহা Waller and B. Sandeeson চক্রান্ত করিয়া Publication বন্ধ করিয়া দিলেন। আমার সেই আবিষ্কার চুরি করিয়া Waller গত নভেম্বর মাসে এক কাগজে বাহির করিয়াছেন। আমি এতদিন জানিতাম না।

তোমার জগদীশ

আনন্দের কথা, শেষ অবধি এই চুরি, ধরা পরে এবং জগদীশ বসু ঐ লেখার জন্য সম্মানিত হন। বিলাতের Royal Society এই চক্রান্ত বন্ধ করে দেয়।

বিদেশে সকলেই তাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করত এই কথা ঠিক নয়। বহু বাধা বিপত্তির মাঝে উনি কিছু ভাল বন্ধুও পেয়েছিলেন। তাদের কাছে উনি যথেষ্ট সাহায্য আর উৎসাহ পেয়েছিলেন। উদাহরণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা একটা চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

লন্ডন, ১৫ অক্টোবর ১৯০১

বন্ধু,

Prince Kroptkin সেদিন বিশেষ রূপে আমার সমস্ত experiment দেখিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় মনস্বী ইউরোপে দুর্লভ। তিনি সমস্ত দেখিয়া বলিলেন আপনার Experiment এবং Argument পরম্পরার মধ্যে সুচাগ্র প্রবেশ করাইবার ছিদ্র নাই। আপনি অবধ্য, কেহই আপনার কেশ স্পর্শ করিতে পারিবে না। আপনি আবরণ ছিন্ন করিয়াছেন। কিন্তু এজন্যই আপনাকে বহু প্রতিবাদ সহ্য করিতে হইবে।

তোমার জগদীশ

এই রচনার শেষে একটা সংক্ষিপ্তসার লিখছি।

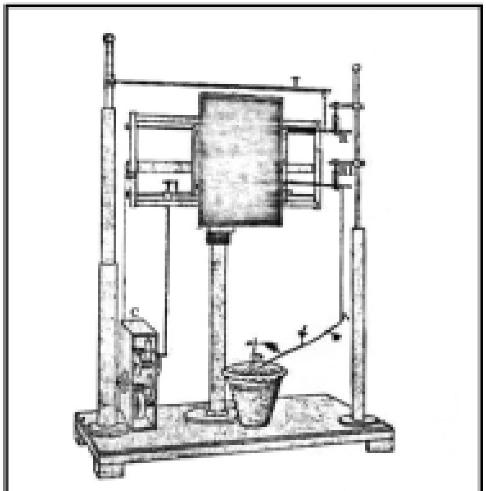

Fig. 2. Apparatus for automatic record of movement of trees and plants: T, differential metallic thermometer; R, recording lever for temperature; RL, for recording plant movement; C, clock-work for oscillation of recording plate. The same clock-work moves plate laterally in 24 hours.

ক্রিস্কোগ্রাফ

আদিকাল থেকেই মানুষ জানে গাছেরা জীবন্ত। তবে তাদের ধারণা ছিল প্রাণী আর গাছেদের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট বিভেদ রেখা আছে। প্রাণীরা প্রাণী আর গাছেরা গাছ, এদের মধ্যে কোন মিল নেই।

জগদীশ বসু সেই ধারণা ভেঙ্গে দেন। কাকে আমি গাছ বলব, আর কাকে প্রাণী বলব, সেই বিচার অবশ্যই করা যায়। তবে এই বিচার খুব বেশি সূক্ষ্ম নয়। আসলে গাছ আর প্রাণীর মধ্যে সঠিক কোন বিভাজন রেখাই নেই। বহু জায়গায় গাছ আর প্রাণীর গুণাগুণ মিশে একাকার হয়ে গেছে। এটাই প্রাণী আর গাছের মধ্যের যোগসূত্র। যদিও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকশিত হয়েছে তবুও আমাদের প্রাণ আর গাছেদের প্রাণ মূলত এক। জগদীশ চন্দ্র বসু এই কথাটাই বিশ্বের সামনে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন।

ছোট ছোট বাচ্চাদের এত সব বুঝিয়ে বলা শক্ত। তাই সহজ করে বলা হয় জগদীশ বসু গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন।

email : cpranabnath@gmail.com • M. 8336006089

Created by deno-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. www.print-driver.com

অনিন্দ্য দে

আপেক্ষিক তত্ত্ব : একটি সহজ পাঠ

প্রাক্-কথন

একটা আজব কল্পনা করুন। নিশুতি রাত। আপনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সেই সময়েই আপনার অগোচরে এই মহাবিশ্বের সবকিছুর আকার দ্বিগুণ হয়ে গেল। মানে ইলেকট্রন, প্রোটন, পরমাণু, আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য, আপনি নিজে, আপনার বিছানা, আপনার বাড়ি-ঘর, পৃথিবী, সূর্য, নক্ষত্রপুঞ্জ সবকিছু আকারে দ্বিগুণ হয়ে গেল। হ্যাঁ, ঠিক এইভাবেই একটা কাল্পনিক পরীক্ষার কথা ভেবেছিলেন উনিশ শতকের বিখ্যাত ফরাসি গণিতজ্ঞ জুল হেনরি পঁয়কারে। তাঁর প্রশ্নটা ছিল ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আপনি কি দেখবেন? একরাতের মধ্যেই যে বিশ্বজগতে এই পরিবর্তনগুলো ঘটে গেছে সেটা কি আপনি বুঝতে পারবেন? সবকিছুই যে আকারে বেড়ে গেছে সেটা প্রমাণ করার জন্য কোনও পরীক্ষা করা কি আপনার পক্ষে সম্ভব হবে?

জুল হেনরি পঁয়কারে

কি, খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন নাকি? না, তার খুব একটা দরকার নেই। পঁয়কারে নিজেই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর স্পষ্ট উত্তর হল—না। এরকম কোনও পরীক্ষা করা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। আকারে বেড়ে গেলেও বিশ্বজগৎটাকে কার্যত একই রকম দেখাবে। এটা যে আকারে বেড়েছে সেই কথাটা বলাই সেখানে অর্থহীন। 'আকারে বড়' বলতে হলে তো 'কোনও একটা কিছুর' সাপেক্ষে বড় বলতে হবে, এখানে সেরকম কোনও কিছুই নেই। ঠিক একইভাবে যদি উলটো ব্যাপারটা ঘটে, যদি একরাতের মধ্যেই এই বিশ্বজগাতের সবকিছু অনেকটা ছোট হয়ে যায় তাহলেও আমরা বলতে পারব না ঠিক কী হয়েছে। তার মানে সোজা কথায় বস্তুর আকার, মানে ইংরেজিতে আমরা যাকে সাইজ বলি, ;সেটা পুরোপুরি একটা আপেক্ষিক ধারণা। ঠিক যেমন লিলিপুটরা গালিভারকে ভেবেছিল দানব আর ব্রবডিংন্যাগের বাসিন্দারা ভেবেছিল ছোট্ট একটা জীবন্ত প্রাণী, সেরকম। আপনি কি বলতে পারবেন একটা বিলিয়ার্ড বল খুব বড়, নাকি খুব ছোট? একটা পরমাণুর তুলনায় সে বিরাট বড় কিন্তু পৃথিবীর সাপেক্ষে সেটা নিতান্তই ক্ষুদ্র। তার মানে অন্য কোনও কিছুর সাপেক্ষে না মাপতে পারলে এই ছোট-বড়র ধারণা তৈরি করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ কোনও বস্তুকে মাপজোক করা এবং সেখান থেকে তার আকার ঠিক কেমন সেটা বলার মত কোনও পরম (ব্যক্তি বা বস্তু-নিরপেক্ষ) উপায় আমাদের হাতে নেই। এক মিটার লম্বা একটা দন্ড বা সেরকম কিছু একটার সাহায্য নিলে তবেই আমরা একটা বস্তুর আকার সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারব।

সময়কালের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটা সত্য। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবী যে সময় নেয়, সেই সময়টাকে আপনার কী মনে হয়—অনেকটা 'বেশি' নাকি নিতান্তই 'অল্প'? একটা ছোট বাচ্চার কাছে একটা দুর্গাপুজোর থেকে পরের পুজোর মাঝখানের সময়টাকে মনে হয় অনন্ত। কিন্তু একজন ভূতাত্ত্বিকের কাছে, যিনি ভূপ্রকৃতিকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যে পরিবর্তন হয়ে চলেছে তা নিয়ে ভাবেন, এক বছর সময়কালটা কয়েকটা মুহূর্ত ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ দূরত্বের মত সময়কালকেও অন্য কোনও সময়কালের সাথে তুলনা না করে মাপা সম্ভব নয়। যেমন সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবী

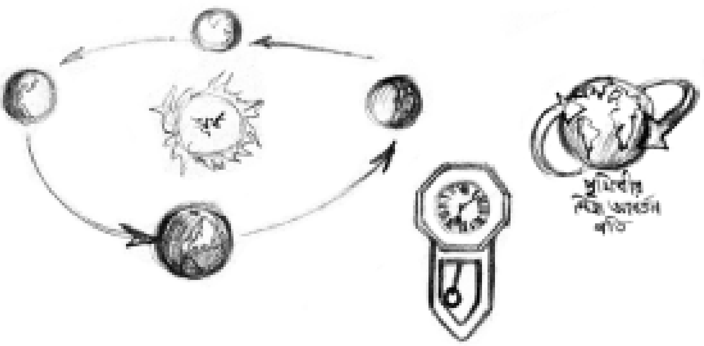

যে সময় নেয় তাকে আমরা বলছি এক বছর, পৃথিবী তার নিজের অক্ষের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে যে সময় নিচ্ছে তাকে বলছি এক দিন, আবার ঘড়ির বড় কাঁটাটা একবার ঘুরে আসতে যে সময় নেয় তাকে বলছি এক ঘন্টা। সবসময়েই কোনও একটা সময়কালকে অন্য কারও সাথে তুলনা করতেই হচ্ছে। কোনও একটা মুহূর্তে এই বিশ্বজগতের সবকিছু যদি কিছুটা কম বা কিছুটা বেশি বেগে চলতে শুরু করে কিংবা বেশ কয়েক লক্ষ বছরের জন্য একেবারেই থেমে যায় তাহলেও কিন্তু সেটা বোঝার মত কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের হাতে নেই। এমনকি, সেই পরিবর্তনটা যে হয়েছে সেটা বলাও অর্থহীন। অর্থাৎ দূরত্বের মত সময়ও আপেক্ষিক।

আমাদের রোজকার জীবনের বেশ কিছু বিষয়ই এরকম আপেক্ষিক। ‘উপর’ আর ‘নীচ’—এই দুটো ধারণার কথাই ধরা যাক। পৃথিবীর যে অঞ্চলে আমরা আছি ঠিক তার উলটো দিকের মানুষজনেরা যে মাথা

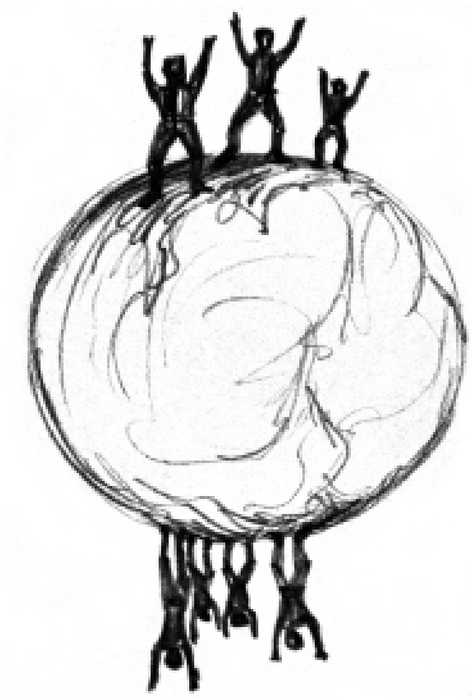

নীচের দিকে আর পা উপরের দিকে করে ঝুলছে না, তাদের শরীরের সমস্ত রক্ত যে মাথায় উঠে যাচ্ছে না—এই ব্যাপারটা প্রাচীন যুগের মানুষদের বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হত। পৃথিবীর আকারটা যে অনেকটা গোলকের মত এই ব্যাপারটা শেখার পর ছোট বাচ্চারাও অনেক সময় এরকম একটা সমস্যায় পড়ে। তবে ভূপৃষ্ঠের উপরে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছুটা সুবিধা আমরা পেতে পারি। যেদিকটা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরে সেদিকটাকে ‘উপর’ দিক, আর যে দিকটা কেন্দ্রের দিকে সেদিকটাকে ‘নীচের’ দিক বলে আলাদা করে ফেলতে পারি। কিন্তু পৃথিবীর বাইরে, মহাশূন্যে তো সেরকম কোনও কিছুই নেই। সুতরাং ‘উপর-নীচ’ ধারণাটা নেহাতই আপেক্ষিক।

ঠিক এরকমই একটা আপেক্ষিক বিষয় হল দর্পণে তৈরি প্রতিফলন। ছাপার পাতায় Я লেখা থাকলে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সেটা R-এর প্রতিফলন। কিন্তু আপনাকে নিয়ে এই সমগ্র মহাবিশ্ব যদি হঠাৎ করে তার প্রতিফলনের মত রূপ নেয় আপনার আমার পক্ষে সেটা বোঝার কোনও রাস্তাই নেই। এইচ. জি. ওয়েলস্ তাঁর The Plattner Story গল্পে এরকম একটা পরিস্থিতির কল্পনা করেছিলেন। এক ব্যক্তি তার প্রতিফলনের মত হয়ে গিয়েছিলেন। সমগ্র মহাবিশ্বের কোনও পরিবর্তন না হলেও তার মনে হচ্ছিল মহাবিশ্বটা যেন উলটে গেছে। কিন্তু সবকিছুই যে ওলোট-পালট হয়েছে সেটা বলাও অর্থহীন হয়ে যাবে।

এবারে আসব গতির কথায়। গতিও কি আরেকটা আপেক্ষিক বিষয়? নাকি আগে যে আপেক্ষিক বিষয়গুলোর কথা বলা হল তাদের থেকে অন্যরকম? যদি তাই হয় তাহলে পরম গতি কি সম্ভব? কোনও বস্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে নাকি চলছে সেটা কি পরীক্ষা করে দেখা কি সম্ভব? যুগ যুগ ধরে এই প্রশ্নগুলো মানুষকে ভাবিয়েছে। আর্কিমিডিস, গ্যালিলিও, নিউটনের মত শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদেরা দিন-রাত এক করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন এর উত্তর খুঁজতে। কিন্তু সঠিক উত্তরটা বের করে আনতে পারেননি কেউই। সেই টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতেই বিশ শতকের গোড়ায় এসে চিন্তা-ভাবনার জগতে ঘটে গেল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। জন্ম নিল আমাদের সাধারণ বোধ-বুদ্ধি এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বিরোধী এক তত্ত্ব, আপেক্ষিকতা-বাদ। কীভাবে? সে ইতিহাস আমরা শুনব। কিন্তু তার আগে আবার একটু ঐ পুরনো প্রশ্নটাতেই ফিরে যাওয়া যাক।

প্রশ্নটা ছিল গতি কি আপেক্ষিক? ধরুন একটা ট্রেন ঘন্টায় একশো কিলোমিটার গতিতে ছুটছে। ট্রেনের ভিতরে একজন লোক ট্রেন যেদিকে যাচ্ছে সেই দিক বরাবর ঘন্টায় চার কিলোমিটার বেগে হাঁটছেন। সেক্ষেত্রে ট্রেনের সাপেক্ষে ঐ ব্যক্তির গতিবেগ ট্রেনের গতির অভিমুখে ঘন্টায় চার কিলোমিটার। কিন্তু মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও দর্শকের বিচারে তার গতিবেগ, ট্রেনের গতির অভিমুখেই, ঘন্টায় একশো চার কিলোমিটার। তাহলে কোন্‌টা তার সত্যিকারের বেগ? না, এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা যদি বিচারের মাপকাঠিটাকে আরও বাড়িয়ে নিই তাহলেই সমস্যাটা টের পাব। আমাদের পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। সূর্য তার সমস্ত সংসার নিয়ে

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
www.print-driver.com

ছায়াপথের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই ছায়াপথও আবার অন্যান্য গ্যালাক্সিগুলোর সাপেক্ষে ছুটে চলেছে অনবরত। আমরা জানি না এই পরম্পরাটা কতদূর চলবে। কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার যে পরম গতিকে লিপিবদ্ধ করার কোনও উপায় আমাদের হাতে নেই, বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় সমস্ত রকমের গতিকে পরিমাপ করার মত স্থির নির্দিষ্ট কোনও নির্দেশতন্ত্র আমাদের হাতে নেই।

তবে যত সহজে এই কথাগুলো বলে ফেললাম ব্যাপারটা মোটেই কিন্তু তত সহজ নয়। তাই যদি হত তাহলে আইনস্টাইনকে এত পরিশ্রম করে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব গড়ে তুলতে হত না, প্রথম থেকেই সবকিছু আমাদের হাতে থাকত। কিন্তু কেন? বিষয়টা সহজে আমাদের বোধগম্য হল না কেন? তার পিছনে আছে আমাদের মত সাধারণ মানুষজনের অতি সাধারণ দুটো ধারণা। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম কোন বস্তুর পরম গতি নির্ণয় করে ফেলাটা অসম্ভব কিছু নয়; সহজ দুটো উপায় আছে। আলোর বেগ নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেই এই ব্যাপারটা বোঝা যাবে আর কোনও গতিশীল বস্তু যখন তার বেগ পালটায় তখন তার উপর যে সমস্ত প্রভাব পড়ে সেখান থেকেও এই কাজটা করা যেতে পারে।

আলোর বেগ থেকে কীভাবে বস্তুর পরম গতি মাপব? তার জন্য উনিশ শতকের পদার্থবিদেরা এক অভিনব ভাবনার আমদানি করেছিলেন। তাঁরা ভাবতে শুরু করেছিলেন সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এক স্থির, অদৃশ্য পদার্থ—ইথার। আলোর তরঙ্গকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়াই তার কাজ। যে কোনও বস্তুর পরম গতি আসলে এই ইথার সমুদ্রের সাপেক্ষে তার আপেক্ষিক গতিই। কিন্তু ইথার যদি এমন একটা মাধ্যম হয় যাকে দেখা যায় না, অনুভব করা যায় না, যার কোনও স্বাদ নেই, গন্ধ নেই, তাহলে তার সাপেক্ষে কোন বস্তুর গতি মাপব কি করে? পদার্থবিদেরা রাস্তা দেখালেন। আলোর গতির সাথে ঐ বস্তুর গতির তুলনা করলেই কাজটা সহজে হয়ে যাবে। না, হল না। আর সেই ব্যর্থতার ভিত্তিভূমির উপরেই আইনস্টাইন গড়ে তুললেন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতার সৌধ। সে গল্প আমরা পরে শুনব। এখন বরং দ্বিতীয় ভাবনাটাকে নিয়ে কিছু কথা বলে নেওয়া যাক।

বিজ্ঞানের নিজস্ব কতগুলো সমস্যা আছে। যেমন বিজ্ঞান-সংক্রান্ত কোনও একটা বিষয় ঠিক কখন চুলচেরা বিশ্লেষণের উপযুক্ত হয়ে উঠবে সেটা নির্ণয় করা বেশ সমস্যার। আবার আমাদের একটা চালু ধারনা হল যে, একজন নির্বোধ লোক অনেক এলোমেলো প্রশ্ন করে গেলেও একজন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি তার তুলনায় উত্তর দেন অনেক কম। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই ব্যাপারটাও কিন্তু একটু অন্যরকম। সেখানে উত্তর দেওয়ার থেকেও সঠিক প্রশ্ন করাটা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ঠিক এরকমই একটা পুরনো বিষয় হল 'গতি'। কোনও একটা গতিশীল বস্তুকে আমরা ঠিক যেভাবে চলতে দেখি, সে ঠিক ঐভাবেই চলে কেন? কে তাকে চালায়? এই প্রশ্নগুলো বেশ কয়েক শতক ধরে মানুষজনকে ভাবিয়ে এসেছে। কোনও একটা জড়বস্তুকে তার নিজের মতো করে চলতে দিলে একসময়ে যে সেটা থেমে যায় সেটা আমরা সবাই দেখি। মাটির

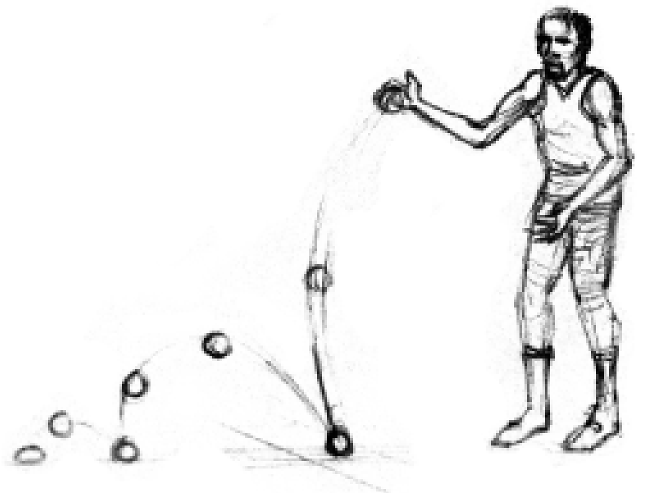

কিছুটা ওপর থেকে একটা টেনিস বল ছেড়ে দিলে বলটা মাটিতে ধাক্কা খেয়ে আবার কিছুটা ওপরে ওঠে। এই সময়ে বলটাকে ধরে না নিলে সেটা বেশ কয়েকবার মাটিতে ধাক্কা খেয়ে ওপরে উঠবে; কিন্তু প্রত্যেকবারেই সেটা আগেরবারের থেকে কিছুটা কম উচ্চতায় উঠবে। অর্থাৎ থেমে যেতে চায়। এমনকি বরফের মতো মসৃণ কোনও তলের উপর দিয়ে চলতে চলতেও একটা পাথর শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে পড়ে। এবারে যদি থেমে যাওয়ার বদলে গতি শুরু হওয়ার কথাটা ভাবতে চাই তাহলে দেখবেন ঠিক শুরুর মুহূর্তে একটা সজীব বস্তুর উপস্থিতিও কিন্তু খুব জরুরী। টেনিস বলকে ছুঁড়ে দিতে হলে একজন খেলোয়াড়কে থাকতেই হবে। তাই তো? কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবুন তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র মাপকাঠিটাকে সরিয়ে রেখে যদি অনেকখানি বড় একটা পরিসরের কথা ভাবা যায় তাহলে কী সবসময়ে ব্যাপারটা এরকমই থাকে? কোনও সজীব বস্তুর উপস্থিতি ছাড়াই তো অবিরাম বাতাস বইছে, নদীতে জোয়ার-ভাঁটার খেলা চলছে, সমুদ্রে জলস্রোত হচ্ছে, আর সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলো তাদের উপগ্রহগুলোকে নিয়ে অনন্তকাল ধরে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে চলেছে। আসল প্রশ্নটা হল তাহলে কোন্‌টা বেশি জটিল—চলন্ত টেনিস বলের থেমে যাওয়া নাকি পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের অবিরাম ঘুরে চলা?

বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে যে, টেনিস বলের লম্ফঝম্ফের ব্যাপারটা আমাদের কাছে অনেক বেশি পরিচিত, সেখানে পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের ঘোরাঘুরির ব্যাপারটা আমরা বুঝতেই পারি না। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই যুগ যুগ ধরে মানুষ ঐ টেনিস বলের গতিটাকে অনেক বেশি সহজ-সরল বলে ভেবে এসেছে। অর্থাৎ একটা গতিশীল বস্তু শেষপর্যন্ত স্থির অবস্থায় এসে পৌঁছবে—এটাকেই আমরা স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিলাম। এমনকি স্থির অবস্থার মধ্যে এমন কিছু আছে যা বস্তুকে সেই দিকে আকৃষ্ট করে—এরকম একটা ভাবনাও জন্ম নিয়েছিল ইতিহাসের কোনও এক পর্বে। ভাবা হচ্ছিল গ্রহ-উপগ্রহের অবিরাম গতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিশেষ কোনও উপকরণের দরকার। এমনকি কেপলারের মতো বিজ্ঞানীও ভাবতেন স্বর্গলোকের নীল পরী লাল পরীদের ডানার ঝাপটেই গ্রহগুলো অবিরাম ঘুরে চলেছে তাদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. www.print-driver.com

ঠিক সেই সময়েই আবির্ভাব হল নিউটনের মতন এক আশ্চর্য প্রতিভার। তিনিই দেখালেন যে স্থির অবস্থার মধ্যে আজব কিছুই নেই; আজকে আমরা যাকে ঘর্ষন বলি সেরকম অতি জটিল কিছু ঘটনা একের পর এক ঘটে চলে বলেই গতিশীল বস্তু শেষপর্যন্ত স্থির অবস্থায় এসে পৌঁছায়। বরং মহাকাশে আমরা যাদেরকে নিরন্তর চলতে দেখি তাদের ব্যাপারটা অনেক সহজ-সরল। সেখানে ঘর্ষনের কোনও বলাই নেই, তাই তারা স্বভাবিকভাবেই গতিশীল। আর সেকথা বোঝাতে গিয়েই নিউটন দেখালেন যে প্রশ্নটাই আমরা ঠিকঠাকভাবে করতে পরি নি। তাঁর যুক্তি একটা বস্তু কত তাড়াতাড়ি কোন দিকে ছুটছে, মানে গতিবেগ সম্পর্কে কোনও ব্যাখারই দরকার নেই, ব্যাখ্যা দরকার গতিবেগ পরিবর্তনের, ত্বরনের।

ত্বরন হল বস্তুর গতিবেগ পরিবর্তনের হার। কোনও বস্তু যে দ্রুততায় ছুটছে তার মান বাড়লে বা কমলে বস্তুর গতিবেগ পালটায়। আবার চলতে চলতে বস্তু যদি তার অভিমুখ পালটে ফেলে তাহলেও তার গতিবেগ পালটে যায়। স্থির গতিবেগ নিয়ে সরলরেখা বরাবর গতিশীল বস্তুর কোনও ত্বরন নেই। কিন্তু এই অবস্থাটা একটু পালটে গেলেই ত্বরন এসে হাজির হবে। নিউটনের মতে এই ত্বরনের ধারনাটাই অনেক বেশি বুনিয়াদি, গতিবেগ আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। আজকের যুগে মসৃণ পথঘাট দিয়ে যানবাহনে চেপে যাওয়ার সময়ে এই কথাটা আমরা খুব সহজেই মিলিয়ে নিতে পারি। বাড়িতে খাবার টেবিল-চেয়ারে বসে কাপে চা ঢালার জন্য এমন কিছু দক্ষতার প্রয়োজন পড়ে না। ঐটুকু দক্ষতা নিয়েই ঘন্টায় আটশো কিলোমিটার বেগে মসৃণভাবে গতিশীল বিমানে বসেও নিশ্চিন্তে কাপে চা ঢালা যেতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির থাকলেও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নয়; কিন্তু সেই পার্থক্যটা কাপে চা ঢালার ক্ষেত্রে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু ভাবুন তো স্থির বেগে চলন্ত একটা ট্রেন যদি জোরে একটা ব্রেক কষে বা রেলের ক্রসিং পয়েন্টে ঝাঁকুনি খায় অথবা স্থির বেগে গতিশীল বিমান একটা বড় বাঁক নেয় তাহলেই কাপে চা ঢালার কাজটা কতখানি কঠিন হয়ে যাবে। যথেষ্ট দক্ষতা না থাকলে এদিকে-ওদিকে চা ছিটকে পড়ে একটা বিশ্রি কান্ড হয়ে যেতে পারে। এখানেই লুকিয়ে আছে নিউটনের অন্তর্দৃষ্টির মহিমা—গতিবেগ কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নয়, গতিবেগ যদি পালটে যায়, মানে ত্বরনের সৃষ্টি হয় তবেই নতুন বিষয়ের অবতারনা ঘটবে। একেই বলা যেতে পারে নিউটনের আপেক্ষিকতার নীতি।

ত্বরনের ধারণাটাকে হাতিয়ার করে নিউটন আরও একটা নতুন ধারণার আমদানি করলেন। সেটা হল ফোর্স বা বল। বিষয়টা খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারি। ধরা যাক একটা সুতোর এক প্রান্তে ছোট্ট একটা ঢিল বেঁধে অপর প্রান্তটা ধরে ঘোরানো হচ্ছে। ঢিলটাকে আমার শরীরের থেকে একই দুরত্বে রেখে দিতে হলে নিরন্তর একটা বল দিয়ে যেতে হবে আর তাতে ঢিলটা বৃত্তপথে ঘুরবে। তার মানে আমি সুতো দিয়ে যে বল দিচ্ছি সেটা ঐ বৃত্তপথের ব্যাসার্ধ বরাবর, মানে ঢিলের গতিপথের লম্ব, আমার দিকে। এই বলই ঢিলটাকে তার কক্ষপথে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ত্বরন যোগাচ্ছে, তার বেগের অভিমুখ পালটে দিচ্ছে।

এই বিষয়টাকেই একটু বড় পরিসরে ভাবা যাক। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর আবর্তনের বিষয়টাকে নিয়েই আমরা ভাবতে পারি। এক্ষেত্রে বস্তুকে গতিশীল রাখার বিষয়টা বোঝার জন্য একটা বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এই ভাবনাটাকে নিয়েই যদি আমরা চলতে চাই, তাহলে খুব স্বভাবিকভাবেই এর কারণ খোঁজার জন্য পৃথিবীর গতির অভিমুখের দিকে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিকে তাকিয়ে আমরা বিশেষ কিছুই খুঁজে পাবো না। পৃথিবী যেহেতু নিজের অক্ষের চারদিকেও ঘুরছে, তাই এক একবার এক এক রকমের দৃশ্য ছাড়া আর কিছুই আমরা দেখতে পাব না। কিন্তু যদি এই গতিপথের লম্ব বরাবর, মানে যদি পৃথিবীর ত্বরনের দিকে আমরা তাকাই, তাহলেই আমাদের চোখ যাবে সূর্যের দিকে। আর সেখান থেকেই আসবে নিউটনের মহাকর্ষের ধারণা।

তার মানে 'পৃথিবীর গতির কারণটা কী?' এই প্রশ্নটা থেকে সরে এসে 'পৃথিবীর ত্বরন হচ্ছে কেন?' এই প্রশ্নটা করাতেই সব কিছু যেন

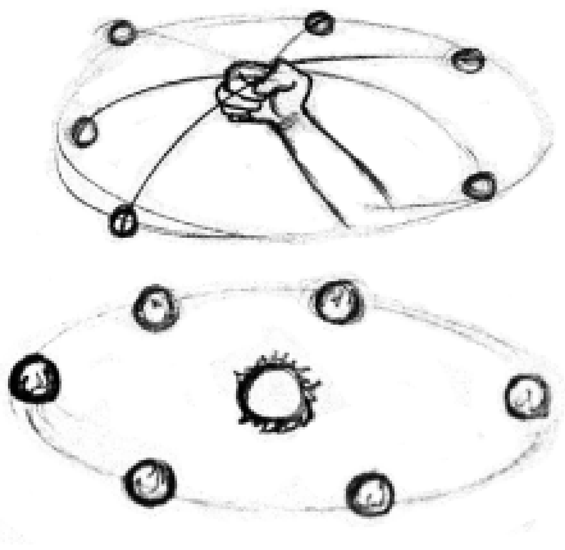

পালটে গেল। আমাদের দৃষ্টিটা ঘুরে গেল সূর্যের দিকে। পৃথিবীর গতির কারণটা আমাদের জানা ছিল না। প্রশ্নটাকে পালটে দেওয়ায় নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণটা যে সূর্য—এই ধারণাটায় পৌঁছে গেলাম। তার সাথে সাথে যেটা ঘটে গেল পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে সেটা অভিনব। যেদিকে তাকিয়ে আমরা সূর্যকে দেখি পৃথিবীর ত্বরনও যে সেইদিকেই। সমন্বয় ঘটল গতিবিদ্যার সাথে আলোকবিজ্ঞানের। আর সেই সমন্বয়ের রাস্তাটা ধরে এগিয়েই আইনস্টাইন পৌঁছে গেলেন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে।।

(চলবে)

email : anindya05@gmail.com • M. 9432220412

Created by demo version of Neevia Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
www.neevia.com

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
www.print-driver.com

ডাঃ শি ব প্র সা দ পা ল

দৃষ্টিপরিধি

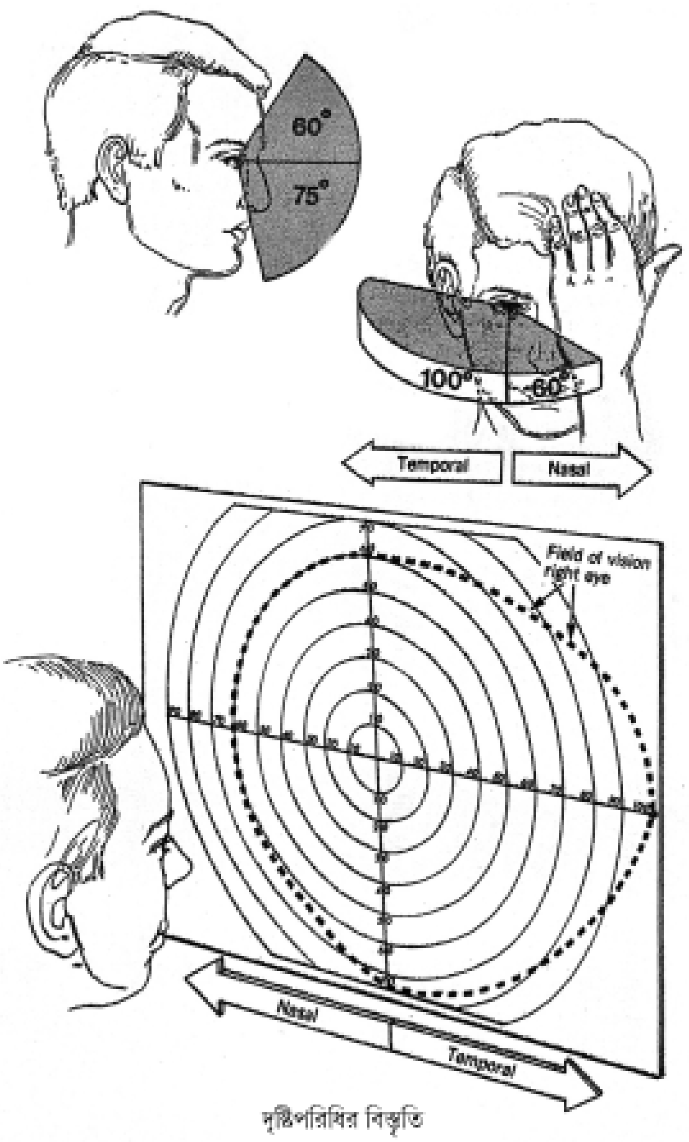

দৃষ্টিপরিধির বিস্তৃতি

নিকট দৃষ্টি দূরদৃষ্টি এসবই আমরা জানি। ভিশন চার্টে পরীক্ষা করে জানা যায়। আর একটি বিষয় ভিজুয়াল ফিল্ড বা দৃষ্টিপরিধি। চোখের উপরে নিচে এবং দুপাশের কতটা আমরা দেখতে পাই, সেটাই হল দৃষ্টিপরিধি। এটি চোখের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা জানা ও বোঝা প্রয়োজন।

এই দৃষ্টিপরিধি প্রথম বর্ণনা করেছিলেন একজন স্কটিশ অপথ্যালমলজিস্ট, নাম হ্যারিমস ট্রাকুয়ার। ইনি জন্মেছিলেন এডিনবার্গে। ট্রাকুয়ার বলেছিলেন 'an Island of vision or Hill of vision is surrounded by a Sea of Blindness'। বাংলায় বলা যায় 'দেখার এক দ্বীপ বা দেখার এক পাহাড়কে ঘিরে থাকে এক না দেখার সমুদ্র।' ভারী সুন্দর এই বর্ণনা। আমাদের দেখার অংশ এক দ্বীপ বা পাহাড় যাকে ঘিরে থাকে না দেখার এক বিপুল সমুদ্র। পাহাড়ের যে পিক বা চূড়া তা চোখের কেন্দ্রবিন্দু ফোভিয়ার দৃষ্টিশক্তি, যা সর্বোচ্চ দৃষ্টিক্ষমতা। রেটিনার 'কোণ' কোষ এই শক্তি নির্ধারণ করে। এর পাশে ১৫° বাইরের দিকে একটি অদেখা অংশ থাকে। একে বলা হয় ব্লাইন্ড স্পট বা অন্ধবিন্দু। এই অংশ অপটিক নার্ভের জন্য বরাদ্দ। রেটিনার সমস্ত স্নায়ুকে একটি গুচ্ছের মত সঙ্ঘবদ্ধ করে অপটিক নার্ভ চোখের পিছনের এই অংশ দিয়ে বেরিয়ে যায় মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে। এই অংশে কোনো দৃষ্টিকোষ রড বা কোন কোষ থাকে না। ফলে অদেখা বিন্দু বা ব্লাইন্ড স্পট তৈরি হয়। এক চোখের ব্লাইন্ড স্পট অন্য চোখে ঢেকে দেয় তাই দুচোখ খোলা থাকলে আমরা ব্লাইন্ড স্পট দেখতে পাই না। পাহাড়ের চূড়ার পাশে এক সরু গভীর খাদের মত দেখতে লাগে এই ব্লাইন্ড স্পটকে।

কনফ্রন্টেশন টেস্ট

সোজা দূরের কোন বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে চোখের উপর, নিচ, ডান দিক, বাঁ দিক এবং পিছনের মস্ত অংশ অদৃশ্য থাকে। এই হল না দেখা অংশ যা বিপুল সমুদ্রের মত। এই দৃষ্টিপরিধি উপর ৬০°, নাকের দিকে ৬০°, নিচে ৭৫° এবং বাইরের দিকে বা কানের দিকে ১০০-১১০° বিস্তৃত থাকে। ফলে এটি ডিম্বাকৃতি আকার ধারণ করে।

পরিমাপ : এই দৃষ্টিপরিধির পরিমাপ আমার দুরকম ভাবে করে থাকি। ১. যন্ত্রের সাহায্যে ২. নিজেরা কোন যন্ত্র না নিয়ে।

১. যন্ত্রের সাহায্যে : দৃষ্টিপরিধি মাপার যন্ত্রকে বলে পেরিমেট্রি। এই যন্ত্রে চোখকে একটা আলোর বিন্দুতে ফিক্স করে বা স্থির করে চারপাশে বিভিন্ন তীব্রতার বিন্দু বিন্দু আলো জ্বালিয়ে নিভিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষার চলিত নাম অটোমেটেড পেরিমেট্রি বা এ.পি. টেস্ট।

২. যন্ত্র না নিয়ে যে পরীক্ষা তার নাম কনফ্রন্টেশন টেস্ট। এর মাধ্যমে সরাসরি পরীক্ষক নিজেই বের করতে পারেন কোন ব্যক্তির দৃষ্টিপরিধি কত। পরীক্ষকের নাক বা চোখের দিকে এক চোখ বন্ধ করে অন্য চোখ দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পর পরীক্ষক তার আঙুলগুলি যেভাবে দেখাচ্ছেন তা সেই ব্যক্তি দেখতে পারছে কি না তার দ্বারাই জানা যায় ঐ ব্যক্তির দৃষ্টি-পরিধির বিস্তার।

আশা করি এই লেখার মাধ্যমে দৃষ্টিপরিধি সম্বন্ধে জেনে তোমাদের জানার পরিধি কিছুটা হলেও বিস্তার লাভ করল।

email : sibprasad@gmail.com • M. 9433564719

সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ গণিত পরিষৎ আয়োজিত ৫ম গণিত সম্মেলন

সুপ্রিয় পাল :

গত ৩রা নভেম্বর রবিবার, নদীয়া জেলার রানাঘাট পুরসভার অন্তর্গত দেবনাথ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ গণিত পরিষৎ এর উদ্যোগে পঞ্চম (৫ম) গণিত সম্মেলন। সম্মেলনের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল রানাঘাট পুরসভা। ISI কলকাতার বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট গণিত ইতিহাসবিদ ড: প্রদীপ কুমার মজুমদার মহাশয়, অধ্যাপক ড: বরুণ কুমার দত্ত সহ বিশিষ্ট গণিতবিদ ও গণিতপ্রেমীরা। রানাঘাট সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে অংশগ্রহণ করে প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অভিভাবক, অভিভাবিকা, শিক্ষক, শিক্ষিকা ও অন্যান্য গণিত পিপাসুর দল।

সম্মেলনের প্রারম্ভিক ভাষণে গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ এর কর্ণধার শ্রী দীপক কুমার দাঁ মহাশয় ও শিক্ষক শ্রী মনতোষ মিত্র, গণিতের জনপ্রিয়করণের পক্ষে বক্তব্য রাখেন এবং গণিত শিক্ষণের জন্য ভয়মুক্ত ও আনন্দদায়ক পরিবেশ গড়ে তোলার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানের মূল অংশে পশ্চিমবঙ্গ গণিত পরিষৎ এর পক্ষ থেকে বাংলা ভাষায় গণিতচর্চা ও গণিত জনপ্রিয়করণের অসামান্য অবদানের জন্য আজীবন কৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ মান্যবরেষু নন্দলাল মাইতি ও মান্যবরেষু, ড: প্রদীপ কুমার মজুমদার মহাশয়কে শ্রদ্ধা-সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রী নন্দলাল মাইতির পক্ষ থেকে ড: আবদুল হালিম শেখ এই সম্মান গ্রহণ করেন।

সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল স্কুল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য গণিত কুইজ, গণিত বিষয়ক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, গণিত কর্মশালা, গণিত বিষয়ক প্রদর্শনী এবং গণিতনির্ভর অঙ্কন প্রতিযোগিতা। এর মধ্যে গণিত অঙ্কন প্রতিযোগিতা বেশ অভিনব এবং মাননীয় শ্রী মনতোষ মিত্রর মস্তিষ্কপ্রসূত। প্রতিটি বিভাগে ছাত্রছাত্রীরা সানন্দে অংশগ্রহণ করে এবং পুরস্কার জিতে নেয়।

সম্মেলনের দ্বিতীয়ার্ধে ড: প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় "গণিত অলিম্পিয়াড" নিয়ে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। অতঃপর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

পরিবেশ ডট কম

বাংলা ভাষায় পরিবেশ ও বিজ্ঞানের একমাত্র চ্যানেল ও পোর্টাল

Mobile - 9051222813
Email - poribesnews@gmail.com
Website - www.poribes.com

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. www.print-driver.com

ম নো তো ষ মি ত্র

গুণনীয়ক ও গুণিতক

পাপানের ভাই তাতান এসে সেদিন বলল—স্যার, আপনি দাদাকেই বেশি ভালবাসেন। যতসব কথা সব দাদাকেই বলেন। আমরা তো বানের জলে ভেসে আসা, তাই আমাদের কোন কদর নেই। বুঝলাম—একটু অভিমানী সুর গলায়। বললাম—এই ধারণা হল কেন তোমার? তোমার কোন্ কথাটা আমি রাখিনি বল। তাতান তখন আমতা আমতা করতে করতে বলল—স্যার 'গুণনীয়ক' ও 'গুণিতক' ব্যাপারটা একটু সহজে বুঝিয়ে বলবেন। বললাম—ওঃ এই কথা। তা আগে বললেই তো হত। বোসো তাতান। তাতান খাটের এক কোণে উঠে বসল। বললাম—শোন তাতান। আমদের প্রথাগত শিক্ষার পাঠক্রম বা পাঠদান পদ্ধতি—সব কিছুই বড় বেশি গতানুগতিক—নিজ নিজ বিষয়কেন্দ্রীক। যেমন, গণিত পাঠের সময় গণিতের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ রাখেন গণিত শিক্ষক। ঠিক তেমনই রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার শিক্ষক তার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখেন তার নিজস্ব বিষয়ের গণ্ডীর ভিতর। ফলে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলোর ভিতর অভ্যন্তরীন সম্পর্কের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হতে না পারার কারণে বিষয়গুলির শিক্ষনীয় বিষয় যেমন ভিন্নতা দোষে দুষ্ট বলে প্রতিভাত হয়, তেমনিই উপলব্ধির অভাবে শিক্ষার্থীর কাছে ব্যাপক বিস্তৃত বলেই মনে হয়। ফলে পাঠক্রমের ব্যাপকতা শিক্ষার্থীর কাছে প্রায় বোঝাস্বরূপ হয়ে ওঠে। এবং শিক্ষনীয় বিষয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাই তাতান এই গুণনীয়ক ও গুণিতক-এর প্রসঙ্গে অন্যভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। উপলব্ধিতে ছুঁয়ে যায় মন। সাধারণতঃ পঞ্চম শ্রেণি বা তদোর্ধ্বে গুণনীয়ক ও গুণিতক কেবলমাত্র একটি অধ্যায়মাত্র। প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকে গুণনীয়ক ও গুণিতকের উপলব্ধিজাত সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে—"একটি সংখ্যাকে অন্য একটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যদি ভাগশেষ না থাকে অর্থাৎ যদি সংখ্যাটি সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হয়, তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে প্রথম সংখ্যার গুণনীয়ক বা উৎপাদক বলে এবং প্রথম সংখ্যাটিকে দ্বিতীয় সংখ্যার গুণিতক বলা হয়।"

উপরোক্ত প্রথাগত প্রচলিত ধারণা দিয়েই সমসাময়িক প্রায় সব পাঠ্যপুস্তকই লিখিত। শিক্ষা সমাপনান্তেও বহু অভিভাবক ও শিক্ষকমন্ডলীর কাছেও তা গাণিতিক খোলসের আড়ালে এক দুর্ভেদ্য বা দুর্বোধ্য গতানুগতিক শিক্ষার প্রভাবে একটি আনন্দহীন মুখস্থনির্ভর তথ্য ভিন্ন পৃথক কিছু নয়। ফলে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষিত হয়েও নিজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় সন্তানাদির শিক্ষার দায়িত্ব তুলে দিতে বাধ্য হন অনুরূপ প্রাণহীন শিক্ষায় প্রায় অর্ধশিক্ষিত কোন শিক্ষক প্রতিনিধির কাছে, ফলে গণিত শিক্ষার আবহ ক্রমশঃ ধারাবাহিক গতানুগতিক প্রবাহে ধাবমান। এ প্রসঙ্গে এস. ওয়াজেদ আলির সেই সুবিখ্যাত মন্তব্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক—"সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে"। সত্যিই তাই। গাণিতিক ধারণার ক্ষেত্রে বোধের স্তরকে উন্নীত করার প্রয়াস হয়ত চলছে কিন্তু সেভাবে দানা বাঁধছে না। তাই তোমাকে নতুন প্রয়াসের কথা শোনাব। তোমার সাথে সাথে পাঠককুল উপকৃত হলেই সার্থক বলে মনে করব। বোর্ডের উপরের দিকে বড় বড় হরফে শিক্ষণীয় বিষয় "গুণনীয়ক, ক্রিয়া ও গুণিতক" এই তিনটি শব্দ লিখে তলায় দাগ দিয়ে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করে সমগ্র বোর্ডটাকে দাগ টেনে তিনটি স্তম্ভে ভাগ করে নিতে হবে। বাঁদিকের প্রথম স্তম্ভের উপরে 'গুণনীয়ক' দ্বিতীয় বা মধ্যস্তম্ভের উপরে 'ক্রিয়া' এবং তৃতীয় বা শেষ স্তম্ভের উপরে 'গুণিতক' লিখে স্তম্ভগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হল। বাঁদিকের তথা প্রথম স্তম্ভের তলে এক, দুই, তিন, চার, পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করলাম। নিম্নরূপ :

'গুণনীয়ক'	'ক্রিয়া'	'গুণিতক'
১) কাপড়, সুতো, বোতাম, শ্রম	সুচিশিল্প প্রক্রিয়া	জামা
২) হাইড্রোজেন, অক্সিজেন।	রাসায়নিক প্রক্রিয়া	জল
৩) জল, চিনি, লেবু	মিশ্রণ প্রক্রিয়া	সরবত
৪) লোহা, জল, বালি, সিমেন্ট, শ্রম	মিশ্রণ প্রক্রিয়া	ঢালাই
৫) ৩, ৫	গুণন প্রক্রিয়া	১৫

প্রথম ক্ষেত্রে বাঁদিকের প্রথম স্তম্ভের নীচে লেখা হল কাপড়, সুতো, বোতাম ও শ্রম। দ্বিতীয় স্তম্ভের প্রথমটি লেখা হল সুচিশিল্প প্রক্রিয়া। আর তৃতীয় তথা শেষ স্তম্ভের নীচে লেখা হল জামা। অর্থাৎ বাঁদিকের প্রথম স্তম্ভের দ্রব্যাদি আর সুচিশিল্পের সমন্বয়ে উৎপাদিত সামগ্রীটির নাম জামা। এর অর্থ হল জামা তৈরি করতে যা যা লাগে তা প্রথম সারিতে এবং যে প্রক্রিয়ায় দ্রব্যটি প্রস্তুত হবে সেটি মাঝের স্তম্ভে। উৎপাদিত সামগ্রী ডানস্তম্ভের নীচে অবস্থান করছে। উৎপাদনে প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি হল গুণনীয়ক আর উৎপাদিত বস্তুটি হল গুণিতক। এই সমস্ত ঘটনা থেকে স্পষ্ট অনুভব করা যায়—যে গুণনীয়ক ও গুণিতকের ক্ষেত্রে দুটি শব্দের খেলাই মুখ্য হয়ে উঠছে। একটি উৎপাদন পূর্ববর্তী, অপরটি উৎপাদন পরবর্তী। উৎপাদনের পূর্বের রাশিগুলি হল গুণনীয়ক আর উৎপাদন পরবর্তী উৎপাদিত সামগ্রী হল গুণিতক। এইরূপ অন্য ক্ষেত্রগুলিও একই হবে।

এই তালিকা তথা টেবিলটি শ্রেণিকক্ষে তুলে ধরলেই শিক্ষক মহাশয়ের শিক্ষণের উদ্দেশ্যের ৭০ শতাংশ পূর্ণ হয়ে যায়। শিক্ষার্থীর চেতনা বা উপলব্ধির স্তর হঠাৎ অনেকটা বেড়ে যায়।

আবার যখন সরবতের ক্ষেত্রে বলা হয় ৫ গ্লাস জল অথবা ১৫ চামচ চিনি তখন সাংখ্যমান ৫ বা ১৫ যা গুণনীয়ক নামক সামগ্রীগুলোর সামনে অবস্থান করে তাকে বলা হয় 'সহগ'। সহগ হল যোগের সূচক বা যোগের পরিচায়ক। নির্দিষ্ট বস্তুটি নিজের সাথে কতবার সংযুক্ত হল সেই পরিমাপক সংখ্যাকে সহগ বলে। এই পর্যন্ত বলে বললাম—তাতান কোন উপলব্ধি হল? তাতান তার বিস্ময় ভরা চোখ

নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল—স্যার এরপর কিন্তু প্রায়ই আসব। ঠিক এইভাবেই শুনে শুনে উপলব্ধির পুঁজিটা বাড়িয়ে নেব।

সেদিন হঠাৎই তাতান এসে হাজির। বললাম—কি ব্যাপার? প্রয়োজন ছাড়া তো আস না, এ কথায় তাতান একটু লজ্জা পেল বটে কিন্তু পিছু হঠবার পাত্র নয়। বলল—স্যার, অনেকদিন আগে বলেছিলেন পীথাগোরাসের সূত্রের একটা সহজ প্রমাণ দেখাবেন। তাই এলাম। যদি একটু বলেন। বললাম—হ্যাঁ মনে পড়ছে। যাই হোক বোস। বলব তো বটেই। বলাই তো আমার কাজ। দাঁড়াও একটা জ্যামিতি বাক্স নিয়ে আসি। একটা ছবি আঁকতে হবে। এরপর জ্যামিতি বাক্সটা ঘরের ভিতর থেকে এনে তাতানের সামনে বসলাম। বললাম—এখন তো পোস্টকার্ড পাওয়া যায় না। পেলে সুবিধা হত। তাতান তৎক্ষণাৎ পোস্টকার্ডের মাপে একটা নিমন্ত্রণপত্র বের করে আমার হাতে দিল। বললাম—বাঃ এতেই কাজ হবে। এরপর আয়তক্ষেত্রিক মাপের কার্ডটির একটি কর্ণ বরাবর দাগ টেনে কেউ দু-টুকরো করে ফেললাম। [চিত্র (i)]

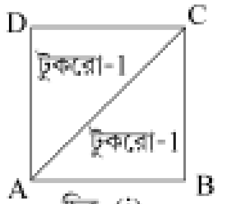

চিত্র (i)

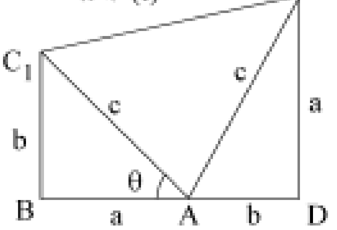

চিত্র (ii)

এইবার টুকরো দুটো রাখা হল [চিত্র (ii)] ঠিক এমনভাবে যাতে একটি ট্রাপেজিয়াম তৈরি হয়। বললাম C ও A বিন্দু কেটে দুভাগ হওয়ায় C বিন্দুর ছিন্ন অংশ দুটি ভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছে বলে C_1 ও C_2 বলে উল্লেখ করলাম। A এর সে দোষ নেই বলে A-কে A বলেই লেখা হল কেমন! তাতান মাথা নাড়ল।

বুঝলাম বেশ উপলব্ধি করছে সে। এরপর দেখ পাপান $\angle BAC_1$ কোণ এর মান θ হলে $\angle BC_1A$ এর মান কত? তাতান সাথে উত্তর দিল—$(90^o\text{-}\theta)$। কারণ A এবং C_1 কোণ হয় পরস্পর পূরক কোণ। শুনে খুশি হলাম।

তাহলে $\angle BAC_1 = \theta = \angle AC_2D$

এবং $\angle BC_1A = 90^o\text{-}\theta = \angle DAC_2$

এর তো কোনো ব্যাখ্যা লাগবে না নিশ্চয়। তাতান বলল—খুব স্পষ্ট বুঝছি। সর্বসমতার সূত্র ধরে। অনুরূপ কোণগুলো পরস্পর সমান। বললাম সঠিক বুঝেছ। এরপর বললাম—তাহলে $\angle C_1AC_2$ এর মান কত হবে? বলতে পারবে? তাতান বলল—$\angle C_1AC_2 = 90^o$। বললাম—কি করে। তাতান লিখে দেখাল—

$\angle BAC_1 + \angle C_1AC_2 + \angle C_2AD = 180^o$ (সরল কোণ)

$\Rightarrow \theta + \angle C_1AC_2 + 90^o\text{-}\theta = 180^o$

$\Rightarrow \angle C_1AC_2 = 180^o\text{-}90^o = 90^o$

বললাম, খুব ভাল বলেছ। এরপর বললাম—

ধরো, AB বাহুর দৈর্ঘ্য = a একক এবং

BC বাহুর দৈর্ঘ্য = b একক

বা, AC বাহুর দৈর্ঘ্য = c একক

অর্থাৎ $AB = a = DC_2$

$BC_1 = b = AD$

$AC_1 = c = AC_2$

জিজ্ঞাসা করলাম—তাতান বুঝতে কোন কষ্ট হচ্ছে।

পাপান বলল—একদম জলের মত। শুনেই বললাম—

এরপর BDC_2C_1 ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি।

ট্রাপিজিয়াম $BDC_2C_1 = \frac{1}{2}$ (সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের সমষ্টি) × তাদের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব

$= \frac{1}{2}(b+a)\times(a+b)=(a+b)^2$ বর্গএকক

আবার ট্রাপিজিয়াম $BDC_2C_1 = \Delta ABC_1+\Delta C_2AC_1+\Delta C_2AD$

$= \frac{1}{2}\ a\cdot b + \frac{1}{2}\cdot c\cdot c + \frac{1}{2}\cdot b\cdot a$

$= \frac{1}{2}\ (2ab + c^2)$ (B)

A ও B তুলনা দ্বারা পাই,

$\frac{1}{2}(a + b)^2 = \Rightarrow \frac{1}{2}(2ab + c^2)$

$\Rightarrow a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2$

$\Rightarrow a^2 + b^2 = c^2$

তাতান যেন শেষের অপেক্ষায় ছিল। ওকে এত খুশি হতে খুব কমই দেখা যায়। ওর খুশিই আমরা সবাই ভাগ করে নিলাম সেদিন।

email : monotoshkumar.mitra@gmail.com • M. 9734695094

পত্রিকা যোগাযোগ

জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 • বারাকপুর পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ M. 8017402774 • প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 • কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 • তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 • কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 • গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 • পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর M. 9331035550 • জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 • কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 • নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 • উৎপল মুখোপাধ্যায় , বারাসাত M. 9830518798 • ভোলানাথ হালদার , বনগাঁও M. 8637847365 • শিয়ালদহ ও যাদবপুর স্টেশন, রানাঘাট, নৈহাটি, কল্যানী, চাকদহ, কৃষ্ণনগর, কাঁচরাপাড়া, মদনপুর, বাদকুল্লা, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) • গৌতম শিরোমনি M. 7364874673 • সবুজ পৃথিবী প্রযত্নে কোডেক্স, ৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. www.print-driver.com

জ য় দে ব দে

ডিম

খাদ্য তালিকায় ডিম একটি অপরিহার্য অংশ। ডিম একটি সুষম খাদ্য।

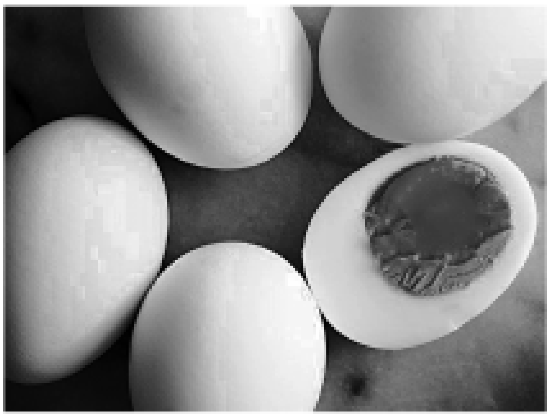

ডিম নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে দেশি না পোলট্রির ডিম? কোনটা খাব? ডিম কেনার সময় যদি দেখি সাদা নয়, তখনই ঘাবড়ে যাই। কিন্তু না ডিমের রঙ হলুদ, বাদামী, এমনকি লালও হতে পারে।

সাধারণ ঘরে পোষা হাঁস বা মুরগির ডিমকে দেশি ডিম আর বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পালিত হাঁস বা মুরগির ডিমকে পোলট্রি ডিম বলে। ঘরে পোষা একটি মুরগির ডিমের ওজন প্রায় ৩০ থেকে ৪০ গ্রাম, আর পোলট্রির ডিমের ওজন প্রায় ৫৫-৬০ গ্রাম। আর এই কারণেই একটি পোলট্রি ডিম দেশি ডিম থেকে অনেক বেশি পরিমাণে পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। তাছাড়া অনেক বেশি পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ আমরা পেতে পারি।

অনেকেই প্রশ্ন তুলবেন, দেশি ডিমের কুসুম লাল আর পোলট্রির ডিমের কুসুম সাদা। একেবারে ঠিক। কারণটা কি জানেন? আসলে ঘরে পোষা ডিমে ভিটামিন এ, ভিটামিন এ অবস্থায় থাকে না। ক্যারোটিন অবস্থায় থাকে। ভিটামিন এ-র পূর্ববর্তী অবস্থাটা আসলে ক্যারোটিন। ক্যারোটিনের রঙ লাল। এই কারণে ঘরে পোষা ডিমের কুসুম লাল হয়। আর পোলট্রির ডিমে ক্যারোটিন থাকে না। ভিটামিন এ থাকে। তাই পোলট্রির ডিমের কুসুম সাদা। কখন কখন হলুদ ভাবও থাকতে পারে। এতে পুষ্টির দিক থেকে কোন তারতম্য হয় না।

ডিমের পুষ্টিমূল্য কতটা?

১০০ গ্রাম ডিম থেকে আমরা ১৬৫ কিলোক্যালোরি শক্তি পেতে পারি। ৫৫-৬০ গ্রাম একটি ডিমে ৭ গ্রাম প্রোটিন, ৬ গ্রাম কার্বোহাইড্রেড, ২ গ্রাম ক্যালসিয়াম, ৮ গ্রাম ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও অধাতব পদার্থ এবং বাকিটা জল। ডিমে প্রায় সব রকম ভিটামিন আর খনিজ পদার্থই থাকে। ডিমের সাদা অংশটি অ্যালবুমিন, যা আসলে একটি প্রথম শ্রেণির প্রোটিন। তাই শরীরের পক্ষে এটি বেশি উপকারী, এর সাথে বাতের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ এতে ইউরিক অ্যাসিড থাকে না। তাই বাতের রোগীদের কোন ক্ষতি করে না। ফ্যাট ও কোলেস্টেরল সাদা অংশে না থাকায় জনডিস বা হার্টের রোগীদের খেতে দেওয়া হয়। লাল অংশটি শুধুমাত্র ভালো এমনটি ভাবলে ভুল হবে। পুষ্টিমূল্যের দিক দিয়ে হাঁস বা মুরগির ডিমে কোন পার্থক্য নেই। তাই পরিমাণ বেশি হলেই পুষ্টিমূল্যও বেশি হবে।

কাঁচা ডিম না সেদ্ধ ডিম? কোনটা খাবেন?

ডিম নিয়ে অনেক ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে রয়েছে। যেমন কাঁচা ডিম খেলে বেশি উপকার হয়। এটি আসলে খুব ভুল ও ক্ষতিকর ধারণা। কিছুদিন ধরে কাঁচা ডিম খেলে শরীরে অনেক ক্ষতি হয়। কাঁচা ডিমে ট্রিপসিন ইনহিবিটর (Tripsin Inhibitor) ও অ্যাভিডিন (Avidin) নামে দুটি ক্ষতিকর পদার্থ থাকে। ট্রিপসিন ইনহিবিটর প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক ট্রিপসিনকে বাঁধা দেয়। এর ফলে হজমে গণ্ডগোল হয়। অ্যাভিডিন আসলে একটি প্রয়োজনীয় ভিটামিন যা বায়োটিনের বিরুদ্ধে কাজ করে। এর ফলে শরীরে নানা ধরনের অসুবিধা হয়। তবে অল্প তাপেই ট্রিপসিন ইনহিবিটর ও অ্যাভিডিন নষ্ট হয়ে যায়। তাই ডিম সেদ্ধ করে খেলে আর সেই ভয়টা থাকবে না। কাঁচা বা আধ সেদ্ধ ডিম কখনই খাবেন না।

কাঁচা ডিম হজম করতেও সময় বেশি লাগে। সেদ্ধ করলে ডিমের প্রোটিনের গঠনের কিছু তারতম্য হয়। শরীরে যে জারক রস থাকে তা ডিমকে হজম করতে সাহায্য করে। তাছাড়া কোলেস্টেরলের মাত্রাকে বেঁধে রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া কাঁচা ডিমে প্রায়ই সালমোনেল্লা নামে এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া থাকে। এর থেকে সালমোনেলোসিস নামে সংক্রামক রোগ হতে পারে। তাই সেদ্ধ করে ডিম সব সময় খেতে হবে। আধ সেদ্ধ বা কাঁচা ডিম খাওয়া শরীরের পক্ষে খুব খারাপ।

অনেক সময় ডিমে এক ধরনের আঁশটে মাছের গন্ধ পাওয়া যায়। এর কারণ হল মুরগির খাদ্যে একটু বেশি পরিমাণে ফিসমিল অর্থাৎ মাছের বিভিন্ন অংশ মেশানো হয়। এক্ষেত্রে ডিমটিকে একটু ভালোভাবে ধুয়ে নিলে গন্ধ কম হবে।

ডিম কিভাবে চিনবেন? ভালো না মন্দ?

বাজার থেকে যখন ডিম কিনবেন কিভাবে চিনবেন ডিমটি ভালো না মন্দ? সহজ একটি পরীক্ষা। ডিমটি আলোর সামনে ধরবেন। ডিমের মাঝখানে ঘন কালো কিছু দেখতে পেলে ডিমটিকে বাতিলের খাতায় ফেলে দিতে হবে। কারণ ডিম পুরনো হলে তাতে আস্তে আস্তে বাতাস জমে বায়ুকোষের সৃষ্টি করে। আর নতুন ডিম হলে কোনরকম কালো ঘন অংশ দেখা যায় না। তাছাড়া অল্পদিনের ডিম হলে বায়ুকোষ (Air Cell) থাকে না।

টাটকা ডিমের অ্যালবুমিন বেশ ঘন থাকে। সেটিকে ঝাঁকালে ভেতরে কিছু একটা নড়ছে বলে মনে হবে না। ঘন অ্যালবুমিনের মধ্যে কুসুম নড়াচড়া করতে পারে না। তাই আলোর সামনে ডিমটিকে ধরলে একটি লালচে আভা দেখা যায়।

আর পুরনো ডিম হলে সেই রকম অ্যালবুমিন আর ঘন থাকবে না। পাতলা হয়ে যায়। কুসুমের আকার বড় হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আলোয় ধরলে ডিমটা নড়ছে বলে মনে হবে।

email : deyjaydev1964@gmail.com • M. 9474330092

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. www.print-driver.com

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

অনিন্দ্য দে

শব্দজব্দ

আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন বাথরুম সিঙ্গার। বাথরুমের ভিতর গান করলে বেশ গমগম করে না? বলুন তো কেন হয়? খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে গান করলে তো এমনটা হয় না! হবে কি করে? তখন তো আপনি গলা থেকে যে শব্দ বেরচ্ছে শুধু সেই শব্দটুকুই শুনতে পান। কিন্তু বাথরুমের ছোট্ট পরিসরে গান করলে ঐ শব্দ কাছাকাছি দেওয়ালগুলোতে বারে বারে প্রতিফলিত হয়। ফলে শব্দের অনুভূতি বেশ দীর্ঘায়িত হয়। তার ফলে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের শব্দ নিরবচ্ছিন্নভাবে আসতে থাকে। তাতে দুটো ব্যাপার ঘটে। বেশি কম্পাঙ্কের শব্দগুলো একের পর এক এসে বেশ গমগমে একটা আওয়াজ তৈরি করে দেয়। আর তুলনায় কম কম্পাঙ্কের শব্দগুলো পরপর এসে তৈরি করে আবেগ। ব্যাস, আপনারও গায়ক/গায়িকা হয়ে উঠতে আর কোনও অসুবিধা নেই। সুতরাং বাথরুম সিঙ্গিং চালিয়ে যান।

নূতন গবেষণার অলিন্দে

অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

একাধিক সূর্যযুক্ত নক্ষত্রমণ্ডল

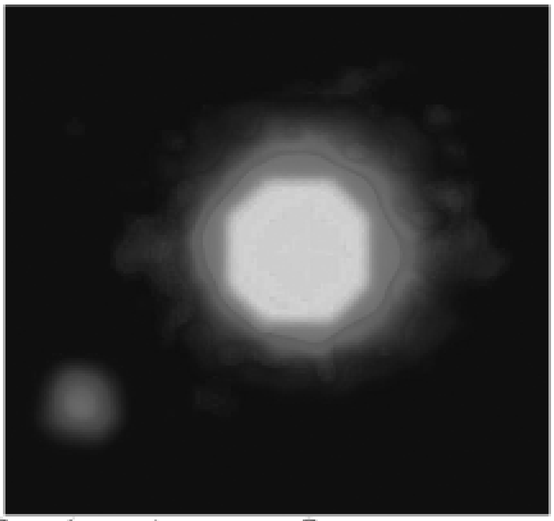

পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহতে কি সত্যিই প্রাণ আছে? হতেও তো পারে দূরের কোনো নক্ষত্রমণ্ডলের অধীনে থাকা কোনো গ্রহে। পৃথিবীর মত একাধিক গ্রহের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন অনেকদিন আগেই। বিগত কয়েক দশকে প্রমাণিতও হয়েছে এই রকমের অনেক (আজ পর্যন্ত প্রায় চার হাজার) নক্ষত্রমণ্ডল ও তাঁদের গ্রহরা। এইসব গ্রহদের বলা হয় এক্সোপ্ল্যানেট। তবে কেমন হবে সেই গ্রহটা যার আকাশে দুটি সূর্য? সত্যিই এমন হয় নাকি? অবিশ্বাস্য মনে হলেও নতুন গবেষণা কিন্তু তাই বলছে। জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী মার্কাস মুগ্রাউয়ার-এর গবেষণা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে Monthly Notices of the Royal Astronomical Society-র জার্নালে। তাঁর কথা অনুযায়ী একের বেশি নক্ষত্র আছে এমন নক্ষত্রমণ্ডলের সিস্টেম আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে অনেক রয়েছে। তবে এই ধরনের সিস্টেমে থাকা গ্রহদের চরিত্র বা আচরণ যে আমাদের চেনা গ্রহদের চেয়ে অনেকাংশে আলাদা হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিজ্ঞানী মুগ্রাউয়ার-এর দলের গবেষকরা ১৩০০-র বেশি এক্সোপ্ল্যানেটের গতিপথ ও এদের নক্ষত্র নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে প্রধান নক্ষত্র ছাড়াও প্রায় ২০০টি সহযোগী নক্ষত্রের উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছেন। দুটি নক্ষত্রের এই সমস্ত সিস্টেমের কোনোটিতে এই নক্ষত্রেরা পরস্পরের থেকে ২০ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট দূরে আবার কোথাও তাদের দূরত্ব ৯০০০ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ১ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট হল সূর্য থেকে ইউরেনাসের দূরত্বের সমান। অধিকাংশ সহযোগী নক্ষত্ররাই লঘু ভরের শীতল বামন নক্ষত্র, যাদের ভর সূর্যের তুলনায় ১.৪ গুণ বেশি থেকে শুরু করে সূর্যের ভরের মাত্র আট শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। একাধিক নক্ষত্রের সিস্টেমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুটি নক্ষত্র থাকলেও গবেষকদল তিনটি বা চারটি নক্ষত্রযুক্ত মণ্ডলের অস্তিত্বও খুঁজে পেয়েছেন। চেষ্টা চলছে আরও তথ্য সংগ্রহের। বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী এই গবেষণা বিভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডলে গ্রহের উৎপত্তি সংক্রান্ত সঠিক তত্ত্বের সন্ধান দেবে।

email : senbu13@gmail.com • M. 8967965340

গৌ ত ম ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

মহাবিশ্বের বিশালতা

জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে অবিশ্বাস মেশানো এক কৌতূহল ছিল সেই ছোটবেলা থেকেই। আমার এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী শিক্ষকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম এ নিয়ে। স্যার আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন গাদিয়ারায় রূপনারায়ণ নদ আর গঙ্গার মোহনায়। দিগন্ত বিস্তৃত জলের বুকে ভেসে থাকা নৌকো থেকে দেখিয়েছিলেন রাতের আকাশ। নক্ষত্র আর ছায়াপথ। সেদিন স্যার একাগ্র মনে যা বলে যাচ্ছিলেন, সেটাই প্রায় তুলে দিলাম—

খেয়াল কর, ঐ যে ধনুরাশি থেকে সাদা ধোঁয়ার মত দক্ষিণ থেকে উত্তরে সিগনাসের দিকে চলে গেছে, ওটাই ছায়াপথ বা মিল্কিওয়ে, আমাদের গ্যালাক্সি বা ব্রহ্মান্ড। ওটা আসলে সূর্যের মত কোটি কোটি তারার ধুলো। ঐ ধুলোর একেকটা কণা একেকটা সূর্য অর্থাৎ তের লক্ষ পৃথিবীর সমান। এমন দশ হাজার কোটি তারা বা সূর্য আছে আমাদের ছায়াপথে। সম্পূর্ণ ছায়াপথকে খালি চোখে দেখা যায় না, যা দেখছিস তা ছায়াপথের সামান্য অংশ। আকাশের সব তারাই আমাদের ছায়াপথের মধ্যে। ধনুরাশির কাছে ঐ ঘন সাদা অঞ্চলে রয়েছে ছায়াপথের কেন্দ্র। কেন্দ্রের তারাগুলো একেকটা সূর্যের প্রায় এক কোটি গুণ বড়। ছায়াপথের দুটি দূরতম প্রান্তের দূরত্ব প্রায় এক লক্ষ আলোক বর্ষ। অর্থাৎ এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আলোর গতিতে যেতে সিন্ধু সভ্যতা প্রায় কুড়িবার জন্ম নিয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে। কেন্দ্রের টানের বিপুল শক্তি ১৩ লক্ষ পৃথিবীর সমান যে সূর্য, এমন দশ হাজার কোটি সূর্যের ছায়াপথকে কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরিয়ে চলেছে সেকেন্ডে ২৫০ কিমি বেগে। ফলে ছায়াপথের কেন্দ্রকে সূর্যের একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে সময় লাগবে ২৫ কোটি বছর। সে সময়ে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা ৫০ হাজার বার জন্ম নিয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে। এই ঘূর্ণনের ফলে আকাশের সব তারাই সেকেন্ডে ২৫০ থেকে ৩০০ কিমি বেগে কেউ কাছে চলে আসছে, কেউ দূরে চলে যাচ্ছে। এই যেমন ধর জ্যোতিষশাস্ত্রের ২৭ নক্ষত্রের একটা নক্ষত্র 'স্বাতী' সেকেন্ডে ২৫০ কিমি বেগে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে। অথচ জ্যোতিষীদের হিসেবে এই গতি নিশ্চুপ। তাহলে কিভাবে সঠিক হিসেব সম্ভব জ্যোতিষচর্চায়। তারাদের এই গতিতে রাশিদের আকৃতিও ক্রমাগত পাল্টে যাচ্ছে। অথচ জ্যোতিষীরা আজও সেই প্রাচীন হিসেবেই দাঁড়িয়ে আছে। আসলে তাঁদের কিছু করার নেই। পুরো শাস্ত্রটাই দাঁড়িয়ে আছে বিজ্ঞানহীন এক অনড়, অচল, উদ্ভট কল্পনার উপর।

স্যার বলে চললেন—গ্যালাক্সিগুলো আবার কয়েকটা গ্যালাক্সির জোট তৈরি করে থাকে—এরা স্থানীয় গ্যালাক্সিপুঞ্জ বা ব্রহ্মান্ড জোট। ২৫-২৬ খানা গ্যালাক্সি নিয়ে আমাদের গ্যালাক্সিপুঞ্জ, যার সর্ববৃহৎ গ্যালাক্সি অ্যানড্রোমিডা ২২ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। আলোর ৯০ শতাংশ বেগে সে আমাদের থেকে প্রতিমুহূর্তে দূরে চলে যাচ্ছে। সিন্ধু সভ্যতার যুগে সে পৃথিবী থেকে ২২ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে থেকে থাকলে আজ ২২ লক্ষ ৫ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। তাই সেযুগের মানুষ অ্যান্ড্রোমিডাকে যেমন দেখত, আমরাও প্রায় তেমনিই দেখি। মহাবিশ্বের বিশালতায় আমার মাথা যখন ভোঁ ভোঁ করছিল, স্যার তখন আরো বিশালতার দিকে ছুটতে থাকলেন—

আবার অসংখ্য গ্যালাক্সিপুঞ্জ নিয়ে একেকটা মহাগ্যালাক্সিপুঞ্জ বা মহাব্রহ্মান্ড জোট। আর সমস্ত গ্যালাক্সি একে অপরের থেকে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে ক্রমাগত দূরে ছুটে চলে যাচ্ছে। টেলিস্কোপে দেখা গেছে এমন কোটি কোটি মহাগ্যালাক্সিপুঞ্জ নাকি এক হাজার কোটি আলোকবর্ষেরও দূরে, সীমানা হারানো মহাশূন্যের বিপুল তিমির গর্ভে ক্ষীণ আলোকবর্তিকার মত যত দূর দেখা যায়, শুধু চলে গেছে অনন্তের দিকে, শেষ হবার কোনো নাকি আভাসই নেই।

বুঝতে পারলাম আমাদের নৌকোটা কী তুচ্ছ আর সামান্য। এর ডুবে যাওয়া না-যাওয়া নিয়ে মহাকাশের কোনই মাথা ব্যথা নেই। নৌকো পাড়ে ভিড়তেই ফিরে এল সাইকেল আর রিক্সার শব্দ নিয়ে পৃথিবীর মাটি। এক মুদিখানার পাশে ছোট্ট এক দোকানঘরে টিমটিমে তেলের আলোয় এক জ্যোতিষী এক বৃদ্ধার ভাগ্য গণনা করছে। কৌতূহলী হয়ে কান পেতে বলতে শুনলাম—ঐ বৃহস্পতি গ্রহটা আপনার সহায় নেই। এইজন্যই আপনার মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে কষ্ট পাচ্ছে। আপনি একটা পোখরাজ ধারণ করলে...।

বি শ্ব জি ৎ মু খো পা ধ্যা য়

বিলীয়মান জীববৈচিত্র—ফিরে দেখা

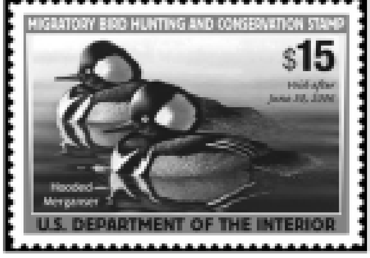

- রাতভোর বৃষ্টি। মাঝে মাঝে থামছে। আবার আসছে। মেঘের মধ্যে চাঁদ প্রায় নিজেকে ঢেকে ফেলেছে। এরই মধ্যে একটু বৃষ্টি থামতে হঠাৎ মাঠ ভর্তি হ্যারিকেনের আলো। অনেক লক্ষ করলে বোঝা যায় হাঁটুর উপর ধুতি তুলে বা কোনো রকমে কৌপিনের মত এক বস্ত্র পরিধান করে কিছু লোক হ্যারিকেন হাতে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ দৃশ্য গ্রামের বহু জায়গাতেই দৃশ্যমান ছিল বা আজও দেখা যায়। কিন্তু কেন এই মানুষগুলো বৃষ্টির জলে ভিজে মাঠের জলের মধ্যে হ্যারিকেন হাতে ঘুরে বেড়াত? কারণ একটাই, ওরা ব্যাঙ ধরছে। ব্যাঙ ধরলেই পয়সা, ভারতবর্ষের মাটি থেকে টিন ভর্তি ব্যাঙ বিদেশে গিয়েছিল আর কিছু লোক উৎফুল্ল হয়েছিল বৈদেশিক মুদ্রা আসছে বলে। গ্রামের মানুষ খেয়ে না খেয়ে এক টাকা থেকে আটানা পয়সার লোভে ক্রমাগত ব্যাঙ ধরে চালান করছে। এই ব্যাঙ চালান মাঠের জীববৈচিত্র্যকে খান খান করে দিয়ে গেল। ব্যাঙেরা পোকা খেত। ব্যাঙকে খেত সাপ। কিন্তু ব্যাঙেরা চলে যাবার জন্য পোকা খাওয়ার কেউ থাকল না। ফলত পোকা মারতে এল রাসায়নিক কীটনাশক ও সার। আর এই সারের ব্যবহারের ফলে মাঠ থেকে মুছে গেল সকল রকম জীববৈচিত্র্য। তার মধ্যে মারা পড়ল সাপ, ইঁদুর ও বহু ধরনের ধান ক্ষেতের মাছ।
- গঙ্গার ধার ঘেঁষে বা সুন্দরবনের ছেলে, বুড়ো, মেয়ে এমনকি বাচ্চারাও হাতে একটি ছোট জাল নিয়ে নেমে পড়েছে মাছ ধরতে। কূলের কাছে কোন বড় মাছ থাকে না। তবে কি ধরছে? ছোট ছোট চিংড়ির বাচ্চা যা আট আনা থেকে খুব বেশি হলে বারো আনায় বিক্রি হবে অপরের কাছে, আর এই চিংড়ি মাছের বাচ্চা ধরতে জালে উঠে আসে অসংখ্য গেঁড়ি-গুগলি সহ অন্যান্য মাছের পোনাও সুতরাং তারা অপ্রয়োজনীয় বলে ফেলে দেওয়া হবে। এই একই প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক বছর নদীর পাড়গুলিতে হাজার হাজার নবজাত প্রজাতির হত্যালীলা চলছে।
- পাঁচতারা হোটেলে হাঙরের ডানার সুপ এক বিশেষ উপাদেয় খাদ্য হিসাবে পরিচিত। এই খাদ্য ডিসের রসনা মেটাতে জীববৈচিত্র্যের পরিণতি কি হচ্ছে সে ব্যাপারে একটু চোখ ফেরাতে হয় দীঘা শঙ্করপুর বা বকখালি সমুদ্রতীরে জেলেদের জালে। অসংখ্য ছোট ছোট হাঙর উঠছে, কাটা হচ্ছে তাদের ডানা। এই ডানা কাটা হাঙর পড়ে থাকছে সমুদ্রের সৈকতে অথবা চপ-কাটলেট হয়ে পরিবেশিত হচ্ছে খাবারের ডিসে। এই প্রক্রিয়ায় চলছে অসংখ্য হাঙরের হত্যালীলা।

২০১০ সাল আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্যের বছর হিসাবে পালিত হয়েছে। ২০১৬ সালে বেআইনি বন্যজন্তু চালানের বিরুদ্ধে বিশ্বপরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করা হচ্ছে এবং তৎসহ বন্যপ্রাণীর অবাধ হত্যালীলা চলছে। বাঘ থেকে ব্যাঙ, তিমি মাছ থেকে হাঙর শিকার কিছুই আর বাদ থাকছে না। হাজার হাজার সামুদ্রিক কচ্ছপ এক দেশ থেকে অন্য দেশে চালান করা হচ্ছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর অর্থ বৃদ্ধির জন্য। দাঁতের জন্য হাতি হত্যা, খর্গের জন্য গন্ডার হত্যা আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তার ফলে বহু প্রজাতি হারিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্য একরকম ছিল না। কোটি কোটি বৎসরের পৃথিবীর ইতিহাসে জীবের একটি প্রজাতি টিকে থাকত গড়ে দশ লক্ষ বৎসর। প্রতি বৎসর দশ লক্ষ প্রজাতির মধ্যে একটির বিনাশ ঘটত স্বাভাবিক নিয়মে। একই সঙ্গে আর একটি প্রজাতি জন্ম নিয়ে প্রকৃতিতে জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষা করত। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে দ্রুত হারে যেভাবে জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে তার ফলে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্র ক্রমশঃই সংকুচিত হয়ে আসছে। বিপদের কথা এই যে আধুনিক শিল্পসভ্যতা জীববৈচিত্র্য বিমুখ। সেইজন্য জীববৈচিত্র্যের বেশি ক্ষয় হয়েছে উন্নত দেশগুলিতে। প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী এডোয়ার্ড উইলসনের মতে এখন পর্যন্ত হিসাবে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের যা বজায় আছে তার অর্ধেক আছে তৃতীয় বিশ্বের উষ্ণ বৃষ্টি প্রধান অরণ্য অঞ্চলে (টাইম, ২৩শে এপ্রিল, ২০০০) কিন্তু যেভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে কম সংখ্যার প্রজাতিই টিকে থাকবে। এদের মধ্যে কিছু আছে যারা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক। পৃথিবীতে কয়েকবার ব্যাপকভাবে প্রাণী সম্পদের বিনাশ হয়েছে। সাড়ে ছয় কোটি বৎসর আগে ডাইনোসর জাতীয় অতিকায় প্রাণী ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীকালের বিপর্যয়ের মধ্যেও আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে আছে

অন্যান্য প্রাণী সম্পদের মধ্যে ইঁদুর, লাল পিঁপড়ে, মাছি, ভারত মহাসাগরে অশ্বক্ষুর কাঁকড়া, যাদের চিহ্ন পাওয়া গেছে কোটি কোটি বছর আগে প্রস্তরীভূত জীবাশ্মের মধ্যে।

ভারতবর্ষের বিপুল জীব সম্পদকে রক্ষা করার জন্য ২০০২ সালে জীববৈচিত্র্য আইন হয়। জীববৈচিত্র্যের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত পরম্পরা জ্ঞানের দ্রুত ক্ষয় ও যথাযথ লভ্যাংশ ছাড়া জীব ও তার জ্ঞান সম্পদের বৈদেশিক ব্যবসায়িক ব্যবহার রুখতেই জাতীয় স্তরের এই আইন। জীববৈচিত্র্য আইন রূপায়নের জন্য তৈরি হয়েছে কেন্দ্রীয় স্তরে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ, রাজ্যস্তরে রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদ এবং স্থানীয় জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি।

পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের প্রধান দায়িত্ব হল রাজ্যের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার জন্য জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও সুস্থিত ব্যবহার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দান ও তা রূপায়ণে সরকারকে সাহায্য করা। এছাড়া জীব সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার অথবা সমীক্ষা বিষয়ে কোন ভারতীয় নাগরিকের অনুমোদন নিয়ন্ত্রণ করা ও রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য আইনের (২০০২) ধারায় যা কিছু করণীয় কর্তব্য তা পালন করা।

পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন করেছে। বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে স্থানীয়ভাবে জীববৈচিত্র্যের সম্পূর্ণ নথিকরণ করতে। এক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পরম্পরা লব্ধ জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জ্ঞানের নথি বা জনজীববৈচিত্র্য নথি তৈরি করার কাজ এই পর্ষদ শুরু করেছে।

জীববৈচিত্র্যের ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন

জীববৈচিত্র্য নিয়মাবলী, ২০০৪-এর ২২ নং নিয়মানুসারে 'জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি' গঠনের পদ্ধতি—

- প্রত্যেক জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি একজন প্রধান বা চেয়ারপার্সন এবং অনধিক ৬ জন অন্যান্য সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সভাপতি/চেয়ারম্যান এই সদস্যদের মনোনীত করবেন, যার $\frac{১}{৩}$ অংশ মহিলা এবং ১৮ শতাংশ তপশিলী জাতি/উপজাতির সদস্য থাকবে।
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন প্রধান বা চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হবেন। এই নির্বাচনে সমান সংখ্যক ভোট হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রধানের কাস্টিং ভোটাধিকার থাকবে।
- প্রত্যেক জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির কার্যকালের মেয়াদ ৩ বছর।
- সমিতির সভায় স্থানীয় বিধান সভার সদস্য এবং স্থানীয় লোকসভার সদস্য বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হবেন।
- জীববৈচিত্র্যে সংরক্ষণ বা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আগ্রহী ও বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেও এই সমিতির 'বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য' হিসাবে নেওয়া যেতে পারে।
- জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠনের পর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (সভাপতি/চেয়ারম্যান) ঐ সমিতির গঠন সম্পর্কে পর্ষদকে জানাবেন এবং সমিতির পরবর্তী কার্যসূচি সম্পর্কে পর্ষদের পরামর্শ চাইবেন।

জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির কাজ

- জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির প্রধান কাজ হল স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে 'জনজীববৈচিত্র্য নথি' (People's Biodiversity Register) প্রস্তুত করা। স্থানীয় জীববৈচিত্র্য ও সেই সম্পর্কিত জ্ঞানের বিস্তারিত তথ্য, তাদের ঔষধীগুণ বা অন্যান্য ব্যবহার সমন্বিত প্রাচীন জ্ঞানের তথ্য এই নথিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।
- জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি এই নথির সত্ত্বাধিকারী।
- স্থানীয় জীবসম্পদ ও সেই সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণের জন্য যে সকল অনুমোদন মঞ্জুর করা হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ, ফি (Levy) সংগ্রহের বিবরণ এবং প্রাপ্ত লাভ ও লভ্যাংশ বন্টনের বিস্তারিত তথ্য সমন্বিত একটি রেজিস্টার সমিতির কাছে রাখতে হবে।
- সমিতি স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্যপূর্ণ সমৃদ্ধ স্থানকে 'Biodiversity Heritage Site' হিসাবে ঘোষণা করার জন্য রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদকে সুপারিশ করতে পারে, যার দেখভালের দায়িত্ব সমিতির হাতে ন্যস্ত থাকবে।

- রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদের পরামর্শক্রমে ও কারিগরী সহায়তায়, সমিতির অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও তার সুষ্ঠ ব্যবহার বিষয়ক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করবে।
- একটি নির্দিষ্ট সময় (২-৩ বছর) অন্তর জনজীববৈচিত্র্য নথি পুনর্বিবেচনা করে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে হবে, যার মধ্যে জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তিত তথ্য নথিবদ্ধ থাকবে।
- অঞ্চলের জীবসম্পদ, তাদের গুরুত্ব ও সংরক্ষণের উপায় সম্বন্ধে স্থানীয় মানুষের সচেতনতা বাড়াতে সচেষ্ট হবে।
- রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদের কারিগরী সহায়তায়, সমিতি জার্মাপ্লাজম ও বীজ সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে, যার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় স্বাভাবিক ও কৃষিজ সম্পদ সংরক্ষণ করা যাবে।
- সমিতি স্থানীয় দেশজ চিকিৎসক ও তাদের দ্বারা ব্যবহৃত জীব সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য রাখবে।
- এছাড়া সমিতি জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদ থেকে প্রাপ্ত জীবসম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কে আবেদন অনুমোদনের জন্য বিবেচনা করে মতামত জানাবে।
- প্রত্যেক সমিতির নিজ নিজ এলাকার জীবসম্পদ ও সেই সম্বন্ধীয় প্রাচীন জ্ঞানের ব্যবহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে।
- পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য নিয়মাবলী, ২০০৫ এর ১৭ নং নিয়মের সাথে সম্পর্কযুক্ত জীবসম্পদ সংগ্রহ ও সেই সম্পর্কিত কার্যকলাপের উপর রাজ্য পর্ষদের অনুমতিক্রমে সমিতি বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে।
- যেসব ক্ষেত্রে ১৭ নং নিয়মাবলী প্রযোজ্য।

১. বিপন্ন প্রজাতি (Endangered Taxa)।
২. দুষ্প্রাপ্য বা ঐ স্থানেই সীমাবদ্ধ প্রজাতি (Rare of endemic species)।
৩. সেইসব জীব সম্পদ, যার অভাবে ঐ জায়গায় মানুষের জীবনজীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
৪. যেসব জীবন সম্পদের সংগ্রহ ও ব্যবহার সেই অঞ্চলের পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে।
৫. সেই সব কার্যকলাপ যার ফলে অঞ্চলের জিনগত অবক্ষয় হতে পারে
৬. যার প্রভাবে ঐ অঞ্চলের সার্বিক জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
৭. জাতীয় স্বার্থ বিরোধী।

- ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি যদি জীবনসম্পদ সংগ্রহ করেন, তবে সমিতি ওই ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ মূল্য (Levy) আদায় করতে পারে।
- জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির কর্তব্য।
- প্রতিটি সমিতি 'স্থানীয় জীববৈচিত্র্য তহবিল' গঠন করবে (সমিতির নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট)।
- এই তহবিল পরিচালনার দায়িত্ব যুগ্মভাবে সমিতির সভাপতি ও অপর এক সদস্যের হাতে থাকবে।
- সমিতির সভাপতি প্রত্যেক আর্থিক বছরের হিসাবনিকাশ সহ বার্ষিক প্রতিবাদন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবেন (জীববৈচিত্র্য আইন, ২০০২ এর ৪৫ নং ধারা অনুযায়ী)।
- রাজ্যের অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের পরামর্শক্রমে তহবিলের সকল হিসাবনিকাশ নিরীক্ষণ করতে হবে (জীববৈচিত্র্য আইন, ২০০২ এর ৪৬ নং ধারা অনুযায়ী)।
- সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য জেলাশাসকের কাছে জমা দিতে হবে (জীববৈচিত্র্য আইন, ২০০২ এর ৪৭ নং ধারা অনুযায়ী)।

স্থানীয় জীববৈচিত্র্য তহবিল

স্থানীয় জীববৈচিত্র্য সমিতি দ্বারা গঠিত জীববৈচিত্র্য তহবিলের অর্থসংস্থান নিম্নলিখিত উপায়ে হতে পারে—

- রাজ্য সরকার মারফৎ অর্থসাহায্য বা ঋণ।
- জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদের অর্থসাহায্য বা ঋণ।
- জীবসম্পদের ব্যবসায়িক কারণে ব্যবহার থেকে আদায়কৃত সংগ্রহ মূল্য।
- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আরও অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া অর্থ।

এই তহবিলের অর্থ স্থানীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, তার উন্নয়ন এবং জীবসম্পদের সাথে যুক্ত স্থানীয় মানুষের সার্বিক উন্নতিকল্পে ব্যবহার করতে হবে।

ভারতবর্ষে পরিবেশ আইনের ব্যাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, আইনের সুচারু প্রয়োগ কতদূর বিস্তৃত। আসুন জীববৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে আইনকে মান্যতা দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

M-8420529966

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. www.print-driver.com

সু ব্র ত রু দ্র

গন্ধরাজ

নিরুপায় হয়ে বাড়ির সামনের জমি বেঁচে দি
সেখানে ছিল এক গন্ধরাজ গাছ
ফুলফোটা গন্ধরাজ গাছকে অসময়ে কেটে ফে
কোনো গন্ধরাজ ফুলের গন্ধ পেলে
তার কথা মনে পড়ে।

জ গ ন্ম য় ম জু ম দা র

এখনো শিখিনি

রোদ ব্যবহার করে আলো জ্বালাতে পারি
জল পারি
হাওয়া পারি
আমরা বিজ্ঞানকে বানিয়েছি তরবারি।

গাছ আমাদের মহান পড়শি, আরশি দেখে না
আঁচড়ায় না চুল
লেখাপড়া করে না
বাড়ি বাড়ি ফুল ফল দেয়, উপকারী।

গান গায় পাখি—আলোর খবর আনে ভোরের কাগজ
চঞ্চুতে অরণ্যের বীজ
ডানায় উড়াল
দেশ কাল বিষয়ে পরিযায়ী পাখি খুব ওয়াকিবহাল।

ঘন মেঘ ভেঙে দিয়ে ফর্সা আকাশ পারি
প্রযুক্তি জেনেছি
সাদা কালো মানুষের ভেদ মেটাতে পারিনি।

আমরা এখনো শিখিনি
ভালোবাসা-জ্যোৎস্না ব্যবহার।

সু নী ল শ র্মা চা র্য

তোমাকে পোড়াবে

আমি তোমাকে কতবার বলেছি,
আর বৃক্ষ ছেদন নয়!
তুমি ততবার উদাসীন থেকেছ—

অরণ্য-বন সাফ করে যে বসত গড়েছ—
তার চারদিকে বাতাসের বিষ বেড়ে যায়—
জল শুকিয়ে যায়, মাছ হারিয়ে যায়
উন্নয়নের ইটপাথরে শান্তির পাখি উড়ে যায়...

তীব্র গরমে হাঁসফাঁস করে মাঠ
পথে পথে হাওয়া লু হয়ে ঘোরে...

তোমাকে পোড়াবে, আমাকে পোড়াবে দহে...

গাছ

গাছ প্রকৃতির রন্ধনশালা
সেখানে কার্বন দিয়ে অক্সিজেন রান্না হয়
সূর্য সেখানে অনুঘটকের কাজ করে

জল-মাটি-পাহাড়, কীট-পতঙ্গ
প্রকৃতির নিয়মে চলে—

শুধু মানুষ চলে না!

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
www.print-driver.com

প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্তি

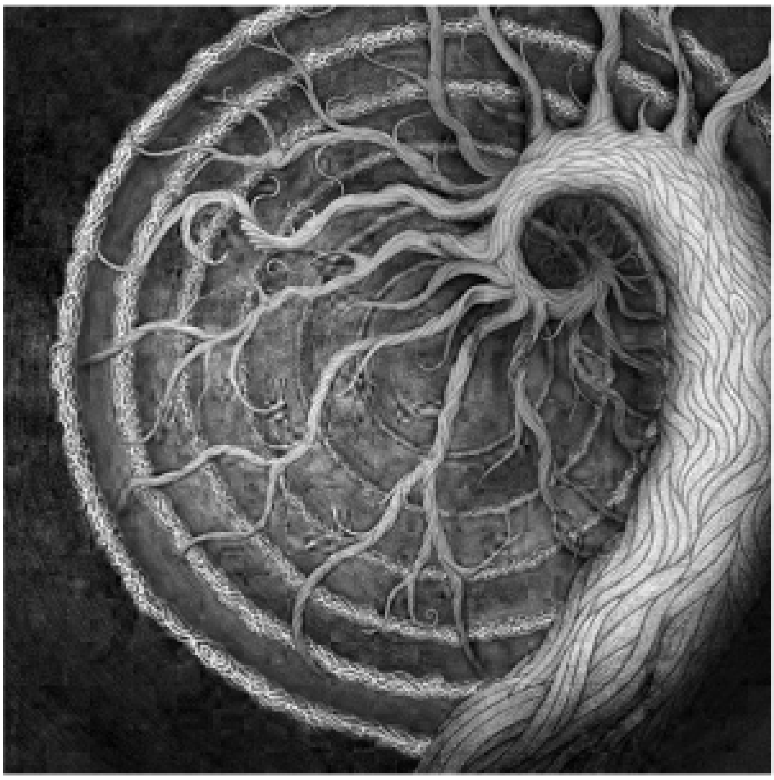

দেবীথানে বেশিরাতে
আর্তস্বর ভাসে—
দেখি গাছ এক মাথা নুইয়ে
ভূমি ছুঁয়ে আছে :
শরীর জুড়ে নানামাপের ঢিল বাধা তার—
হাহাকার ছড়ায় আজ ভারাক্রান্ত গাছ!

ধীরে ধীরে
মানতের ঢিল বাধা দড়িগুলো খুলি
গাছও মুক্তি পেয়ে মাথা তার তোলে;
বহুদিন পরে বাতাসে দেহ দোলে তার—
সংস্কারের ফাঁসগুলো খুলে খুলে পড়ে :

প্রাণ পেয়ে গাছ
ক্লোরোফিলের দরজা খুলে দেয়—
মানুষ সবুজে সবুজে খোঁজে আগামী সকাল।

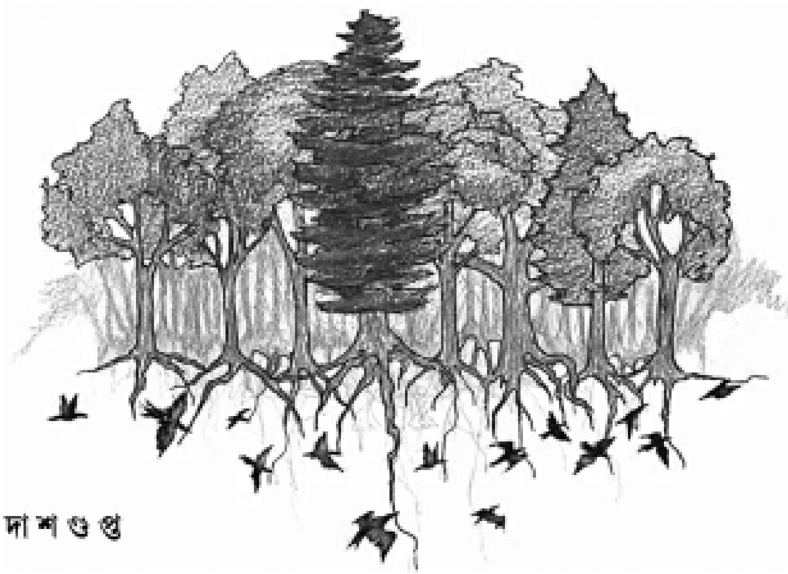

শিবপ্রসাদ পাল

নয় অজানা

সূর্যালোকে রান্না হয়
গাছের মজা বেশ
পাতার ক্লোরোফিলে
সালোকসংশ্লেষ।

ছুঁলেই পাতা বোজে
নয় অজানা কথা
পালভিনাসের কাজ
লজ্জাবতী লতা।

পাতায় ছাড়ে অক্সিজেন
সারাদিনতো অতন্দ্র
প্রমাণ করে গেছেন
বসু জগদীশ চন্দ্র।

নির্ম্যাল্য দাশগুপ্ত

অশনি

উঠে আসে জল—
পৃথিবীর পেট থেকে ছুটে আসে
দুরন্ত প্লাবন—

চূড়ান্ত হতাশার মাঝখানে
কেঁদে যায়
বৃক্ষহীন জঙ্গম
একাকী সমুদ্র-শয্যায়।

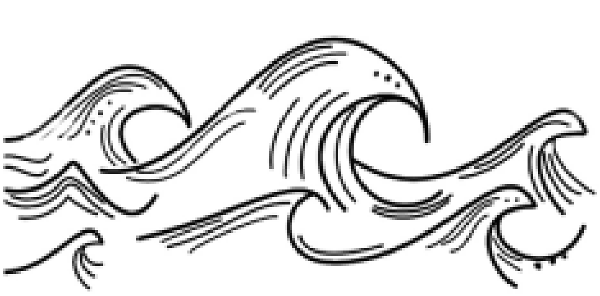

অনুপ হালদার

আন্তঃসীমান্ত নদী

Trans boundary River *বা আন্তঃসীমান্ত নদীগুলি হল এমন নদী যেগুলি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এগুলি আন্তর্জাতিক নদী হিসেবেও পরিচিত বর্তমান প্রবন্ধে ভারত ও বাংলাদেশের আন্তঃসীমান্ত নদীগুলির সংখ্যা ও এইসব নদী ও আন্তর্জাতিক জলাশয়গুলির ওপর দুটি দেশেরই উদাসীন মনোভাবের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।*

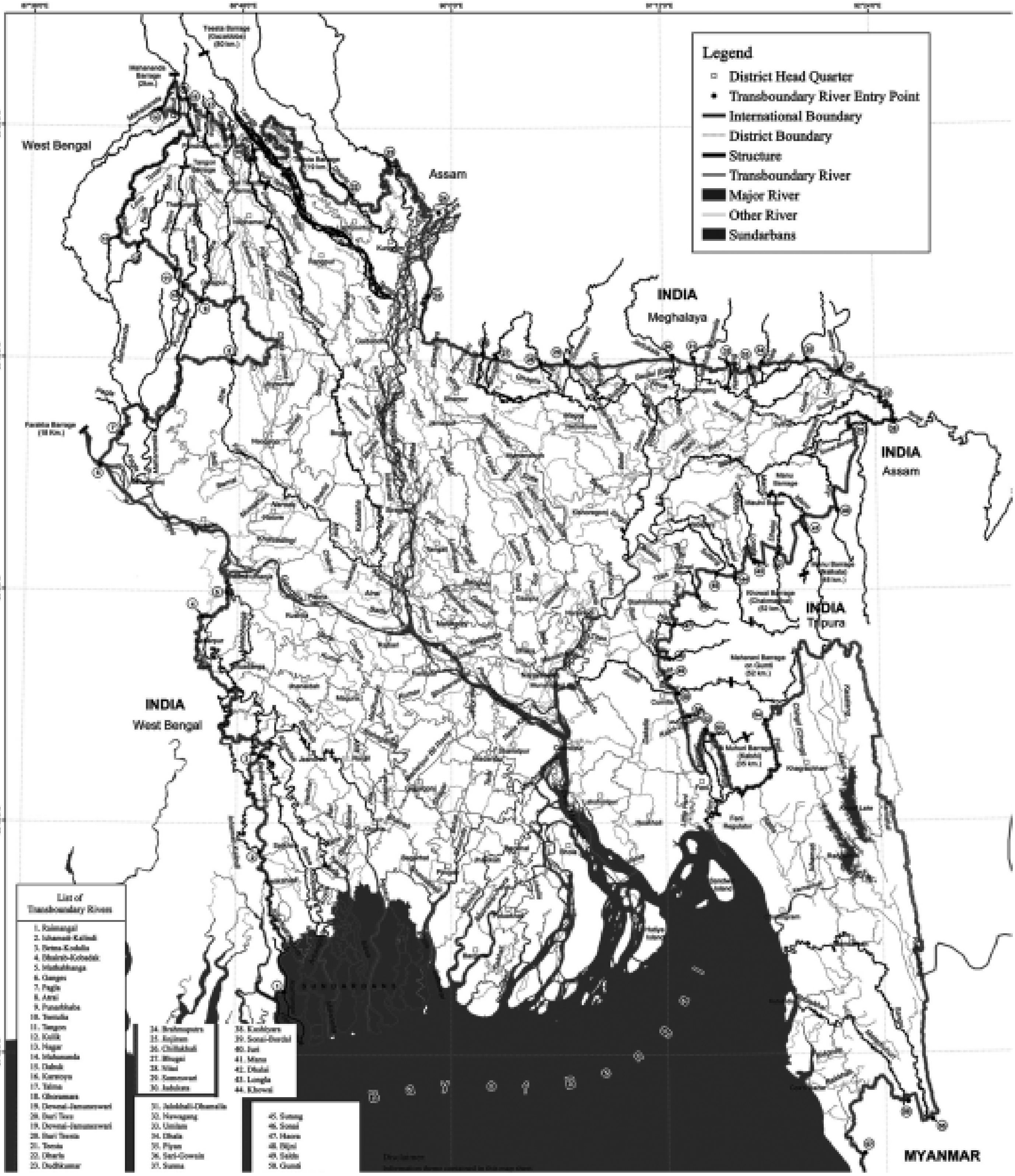

১৯৯২ সালে হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম আন্তঃসীমান্ত নদী নিয়ে কনভেনশন যা হেলসিঙ্কি কনভেনশন নামেও খ্যাত।

উক্ত কনভেনশনে আন্তঃসীমান্ত নদীর যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে সেটি হল দুই বা ততোধিক দেশের সীমান্ত অতিক্রমকারী ভুউপরস্থ ও ভূগর্ভস্থ জলপ্রবাহ ভিত্তিক যেসব নদনদী আছে সেগুলিই আন্তঃসীমান্ত নদী।

ভারত বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ৫৪টি নদী প্রবাহিত। বাংলাদেশের পিউবো (পানি উন্নয়ন বোর্ড), ভারতীয় নদীমন্ত্রক এবং জাতীয় নদী কমিশন দ্বারা স্বীকৃত নদীর সংখ্যা ৫৪টি হলেও আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা করে জানতে পেরেছি যে এখন বর্তমানে ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে ৯৬টি নদী। বাংলাদেশ থেকে ৬টি নদী উৎপত্তি লাভ করে ভারতে প্রবেশ করেছে (কুলিক, বেরং, ভেরসা, রাক্ষসিনী, তেঁতুলিয়া বা তুলাই, লোনা বা নোনা এবং ভাতা) অর্থাৎ ১০২টি নদী। এই ৬টি নদীর মধ্যে কুলিক, রাক্ষসিনী, তেঁতুলিয়া বা তুলাই যৌথ নদী কমিশনের দ্বারা স্বীকৃত হলেও বাকি ৪টি নদী যৌথ নদী কমিশনের তালিকা বহির্ভূত। এছাড়াও চিরি নামক নদীটি দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলা এলাকায় উৎপত্তি লাভ করে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং পুনরায় ভারত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এরপর নওগাঁ জেলাধীন ছোট যমুনা নদীতে পতিত হয়েছে। তালিকা বহির্ভূত অপর একটি নদী ইছামতি (দিনাজপুর) যেটি স্থানীয় নাম ঘুকসি নামে পরিচিত। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যৌথ নদী কমিশনের তালিকা বহির্ভূত ৪৮টি নদীর মধ্যে ৪৪টি সরাসরি ভারতের সীমানা অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। নদীগুলি হল কর্ণফুলি, লুভা, আমরি, শিলাইদহ, গঙ্গাধর, ফুলকুমার, হাড়িয়াভাঙা, চাওয়াই, গিদারি, কুরুম, পাঙ্গা, রেংখিয়াং, কাসাল, মাইনি, মালদাহা, সিমলাজান, উপাদাখালি, কর্ণঝোরা, কর্ণবালজা, কালাপানি, খাসিমারা, ঘাগটিয়া, চেলা, জাফলং, ডাউকি, জালিয়াছড়া, দুধদা, নয়াগাঙজৈন্তাপুর, মহারাশি সোমেশ্বরী (ধর্মপাশা), সোমেশ্বরী-শ্রীবর্দি, ঘুংঘুর, ডাকাতিয়া, লহর, ঘুকসী, চিংগ্রী বা চেঙ্গী, যমনু্া পঞ্চগড়, সিংগিমারী, সাউ, আলাই কুমারী, সুই, হাড়িয়া, চিরি বা শ্রী নদী সংকোশ আর তালিকা বহির্ভূত অবশিষ্ট নদীগুলি বেরং, ভেরসা, লোনা ও ভাতা বাংলাদেশে উৎপত্তি হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে।

বিশেষতঃ মেঘালয়, গারো, খাসিয়া, জৈন্তি পাহাড় ও মিজোরাম পাহাড় থেকে নেমে বাংলাদেশের দিকে বয়ে যাওয়া এমন অনেক নদীর সংখ্যা রয়েছে যেগুলির পূর্ণতালিকা প্রস্তুত হলে বা আমাদের সামনে এলে আন্তঃসীমাত নদীর সংখ্যা দ্বিগুণ হবে। এবার আসা যাক নদীর শাষন-এর কথায় স্বাধীনতার এত বছর বাদেও আন্তর্জাতিক নদীগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হল না কেন এটি একট বিরাট প্রশ্ন। আসলে অন্তর্জাতিক নদীগুলিতে যৌথনদী কমিশনের তকমা লেগে গেলেই আন্তর্জাতিক নদীনীতি বা জলনীতি মেনে চলতে হবে উভয় দেশকেই। (যদিও ভারত বা বাংলাদেশ কেউই এর তোয়াক্কা করে না দুটি দেশই তাদের নিজেদের ইচ্ছেমেন নদীকে ব্যবহার করছে বাংলাদেশ ভাটির দেশ হওয়ার কারণে বেশিরভাগ নদী ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে উৎপত্তি লাভ করে বাংলাদেশ হয়ে সাগরে মিশেছে। বেশ কিছু নদী বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে।

ভারত থেকে প্রবাহিত ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদীর ওপরে আগেই ৪২টিতে স্থায়ী বা অস্থায়ী বাঁধ দিয়েছে ভারত। বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবাহিত ৬টি নদীর মধ্যে ৩টি নদীতে পাকাপাকি বাঁধ দিয়েছে বাংলাদেশ। বাকি তিনটি নদীর ক্ষেত্রে উৎসমুখই বিনষ্ট করে দিয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের থেকে উৎপত্তি লাভ করে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে ভারত ভূখণ্ডের বহুদূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে আবার বাংলাদেশে গিয়ে পড়েছে। এমন নদীর সংখ্যাও নেহাতই কম নয়। সেই নদীগুলির ক্ষেত্রে পুরো নদীটিই একেবারে দখল হয়ে গেছে। আসলে প্রবাহমান একটি জলধারা আদিঅনন্ত কাল ধরে সেটির বুকে এইভাবে বাঁধ দিলে একদিকে যেমন নদীর বহমানতা খর্ব হয় তেমনি নদীর বাস্তুতন্ত্র, জীববৈচিত্র্য, ভূগর্ভস্থ জলস্তর এর ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ইতিমধ্যেই সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে পড়ছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা আর্সেনিক মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় ইতিমধ্যেই ভূগর্ভস্থ জলস্তর মারাত্মক ভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে।

আন্তঃসীমান্ত নদী কোদালিয়া সীমান্তবর্তী জেলা উত্তর ২৪ পরগনা ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানার থেকে বাংলাদেশেণ দিকে মাত্র ১৫০ মি: দূরে একটি স্লুইস গেট নির্মাণ করে নদীকে কার্যত দুটি ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। বাংলাদেশ নদীর বুকে বড় বড় বাঁধাল দিয়ে চিংড়ির ভেরি, নদীসংলগ্ন বিলাঞ্চলগুলি ধানের জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। নদীটি বাংলাদেশে উৎপত্তি হলেও আন্তর্জাতিক সীমানার গা ঘেঁষে ৩/৪ বার সাপের মত এঁকেবেঁকে আবার বাংলাদেশে পড়েছে। নদীটির প্রায় ৬০ ভাগ দখল হয়ে গেছে বাংলাদেশের দিকে। ভারতের দিকে নদীর প্রশস্ততা ২৫০/৫০০ মি: এর মত হলেও বাংলাদেশের দিকে এর প্রশস্ততা ৫০/৭০ মি: এর মত।

সীমান্ত নদী সুরমা ও কুশিয়ারার মাতৃনদী বরাক, ভারতের মনিপুর রাজ্যের তুইমই ও তুইরয় নদী দুটির মিলিত স্রোতধারার নাম বরাক এই নদী দুটির সঙ্গমস্থল থেকে প্রায় ৫০০ মি. পশ্চিমে মনিপুর রাজ্যের চুরাচাঁদপুর জেলার দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল টিপাই মুখে হাইড্রোইলেট্রিক বাঁধ নির্মাণ করেছে ভারত ফলে আন্তঃসীমান্ত নদী (২৪৯ কিমি.) কুশিয়ারা ২৮০ কিমি. নদী দুটির মৃত্যু অনিবার্য।

বাংলাদেশ বহুকাল আগেই সীমান্ত নদী কপোতক্ষ এর উজান এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। ২৩৮ কিমি. নদীটির ৭০ ভাগই মৃত। নদী জুড়ে শুধুই কচুরিপানায় আবদ্ধ। নদীখাত দখল করে বাড়ি বাজার, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, আবার কোথাও চাষের জমি বা মাছের ঘের। ভারত সীমান্তে নদীটিতে এখনও কোথাও কোথাও ৩০০/৪০০ ফুট চওড়া এবং ১৫/২০ ফুট গভীর। নদীটি এরপর যতই বাংলাদেশের দিকে এগিয়েছে ততই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে।

সীমান্ত নদী সিলোনিয়া ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ফেনীর

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
www.print-driver.com

Created by demo version of Internet Document Converter, full version doesn't add this stamp. www.iddc-soft.com

পরশুরাম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে ভারতের দিকে সীমান্তের কিছুটা ভেতরে পাম্প বসিয়ে শুকনো জল তুলে নেয় ভারত। এছাড়া সীমান্ত নদী ধলা, মনু, পিয়াইন, খোয়াই নদীতে বাঁধ নির্মাণ করেছে ভারত। পিয়াইল নদীর মাতৃনদী ডউকি নদীর পশ্চিম তীরে ভারত ৪৩ মি. লম্বা ৯ মি. চওড়া, ৯মি. উঁচু গ্রোয়েন নির্মাণের ফলে জাফলং কোয়ারিতে পাথর যাওয়ার পরিমাণ কমে গেছে।

আন্তঃসীমান্ত নদী মাথাভাঙার উৎস নদীয়া জেলার পায়রাডাঙার কাছে গঙ্গানদী। মোহনা পদ্মা কিন্তু ফারাক্কা বাঁধের কারণে মধ্য ও নিম্ন গঙ্গার অস্তিত্ব এখন সঙ্কটাপন্ন ফলে জোয়ারের জল চুর্ণির শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। ফলে এখন শুধুমাত্র পদ্মার জল মাথাভাঙা দিয়ে চুর্ণির মাধ্যমে গঙ্গাতে প্রবেশ করে ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের ওপারে আনুমানিক ১০ কিমি. দূরে বাংলাদেশ সরকারের একটি কারখানা কেরু এন্ড কোং (প্রায় ৩ হাজার হেক্টর জমির ওপর তৈরি)। প্রথমত এটিতে চিনি তৈরি করা হলেও বর্তমানে (আনুমানিক ৩০ বছর) ধরে প্রায় আট থেকে ১০ প্রকার মদ তৈরি হয়। এছাড়াও প্রায় ২৪ রকমের বাইপ্রোডাক্ট প্রস্তুত হবার পর সেই যাবতীয় দূষিত জল বাংলাদেশ মাথাভাঙা নদীতে কোনোরকম পরিশ্রুত না করেই ফেলে এবং মাথাভাঙার সাথে সাথে চুর্ণি ও গঙ্গাও প্রবল ভাবে দূষণের কবলে পড়ছে ১.৫ লক্ষ মৎসজীবী তাদের পেশা হারিয়েছেন। ১৩৬টি গ্রামের মানুষ ভিটেমাটি ছাড়া ওই তীব্র দূষিত জলের কারণে। এছাড়াও ভূগর্ভস্থ ওই জলও দিনে দিনে বিষিয়ে উঠছে দূষণের কারণে।

আন্তর্জাতিক পানি নীতির আর্টিকেল ৫-এ বলা হয়েছে যে জলপ্রবাহের উজান ও ভাটির প্রতিটি দেশের নদীপ্রবাহের সুবিধা ভোগ করার অধিকার রয়েছে।

এক্ষেত্রে জলবন্টনের চুক্তির স্বাক্ষরের সময় পারস্পরিক চাহিদা বর্তমানের ব্যবহার এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন ইত্যাদির বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে উভয় দেশকেই দেখতে হবে।

আন্তর্জাতিক জলনীতি আর্টিকেল ৭-এ বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক নদী সম্পদ ব্যবহারে ভাটির দেশগুলিকে ক্ষতিগ্রস্থ না করার বাধ্যবাধকতা। আর্টিকেল ৮, ৯, ১১-তে রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কিত মূল নীতি।

বাস্তবে দুটি দেশের নদীপরিকল্পনা বর্তমানে প্রহসনে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার পর এতগুলি বছর কেটে যাওয়ার পরও আন্তর্জাতিক নদীর তথ্য ও পরিসংখ্যান কেন গোপন করা হল? প্রবাহমান এই সকল নদীগুলির ওপর বড় ড্যাম বানিয়ে। কখনও উৎসমুখ বিনষ্ট করে নদীগুলিকে স্তব্ধ করার প্রয়াস যেমন এদেশের সরকারের তেমনি ওপার বাংলাতেও। নদীর মৃত্যু সে তো সভ্যতারই মৃত্যু ভারতের সীমান্তবর্তী জেলাতে (নদীয়া, ২৪ পরগনা, দিনাজপুর) তীব্র আর্সেনিক ফ্লোরাইড-এ আক্রান্ত পানীয় জলের দ্বারা তেমনি বাংলাদেশের ৪০ মিলিয়নের অধিক মানুষও একই ভাবে আক্রান্ত।

এর মধ্যেই খবরে প্রকাশিত আত্রেয়ী নদীতে ড্যাম দেবে সরকার বাংলাদেশের সুনামগঞ্জের মেহেরপুরে ড্যামের (রাবার ড্যামের) পাল্টা ড্যাম দেবে আমাদের রাজ্য সরকার। উৎস ও মোহনা ছাড়াও এমন অনেক নদী আছে যেগুলি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ঘুরে আবার ভারতে পতিত হয়েছে এমন প্রায় সব নদীতেই স্থায়ী বাঁধ দিয়েছে বাংলাদেশ। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই বঙ্গভূমির মূল চাবিকাঠি লুকিয়েছিল এই সকল নদী ও জলাভূমির কাছেই। আজ তারা আক্রান্ত হবার সাথে সাথেই আক্রান্ত হয়েছি আমরা।

আন্তর্জাতিক জলাভূমি বেড়ি পাঁচপোতার বাঁওড়, শশাডাঙার বাঁওর, ডুমোর বাঁওড়, বেরি বাঁওড়, বিলহলদি, গেদের কাছে পুরাতন কপতক্ষ নদ, করিমপুরের ভৈরব, সুহিনগর বাঁওড়, শিকড়া বাঁওর, নাকাশিপাড়া, গাছিনা বিল, বালুরঘাট, হিলি, শ্রীনদী (বালুরঘাট), ভেওয়া বিল দিনাজপুর।

টাঙ্গুয়ার বাঁওর মেঘালয় থেকে নামা ১৩/১৪টি জলপ্রপাত মিশেছে এই বিলে প্রায় ১ লক্ষ বর্গকিমির বেশি জায়গা জুড়ে অবস্থান।

আন্তর্জাতিক জলাভূমির সংজ্ঞায় ভূগর্ভস্থ এবং উপরস্থ জলপ্রবাহের উল্লেখ থাকলেও আন্তঃসীমান্ত জলাভূমিগুলির ওপর তেমন কোন নজরই ভারত ও বাংলাদেশ কোন দেশ দেয়নি। অথচ কি বিরাট জলভান্ডার হেলায় আমরা হারিয়ে ফেলছি এই জলসংকট এবং গোটা বঙ্গ জুড়ে যখন ভূগর্ভস্থ পানীয় জলে বিষ মিশে আমাদের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে তখন শুধু মাত্র পরিকল্পনার অভাবে দুটি দেশেই মারাত্মক ভাবে থাবা বসিয়েছে ফ্লোরাইড নাইট্রেট, আর্সেনিক জলাভূমি শুধুমাত্র পরিশ্রুত জলাভূমি শুধুমাত্র পানীয় জলই দেবে না, কৃষি, শিল্প, মৎস্য চাষ, পর্যটন শিল্প সর্বোপরি বাস্তুতন্ত্র রক্ষিত হবে। বেশিরভাগ জলাভূমিগুলি বর্তমানে দখল হয়ে যাচ্ছে বা কচুরিপানাতে আবদ্ধ হয়ে মশার আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানের এই আন্তঃসীমান্ত নদীগুলির প্রতি দুটি দেশেরই এই উদাসহীন মনোভাব আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও বিপদের দিকে ঠেলে দিতে পারে ভবিষ্যৎ সমস্যাগুলি, জলপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হবে, ভূমিরূপ গঠন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ-এর জীববৈচিত্র হ্রাস পাবে, কৃষি ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে, জনজীবন ক্ষতিগ্রস্থ হবে, জীবনধারার মানের পরিবর্তন হবে, শিল্প ও বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হবে, সর্বোপরি সামাজিক অস্থিরতা নেমে আসবে। এছাড়াও বন্যা সংকট শুষ্ক মরসুমে নিম্নপ্রবাহে লবণাক্ত জলের প্রবেশ ঘটবে। ভূগর্ভস্থ জলের আকাল দেখা দেবে, মাটির উর্বরতা হ্রাস পাবে, সুন্দরবন হারিয়ে যাবে এবং জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটবে।

আন্তর্জাতিক নদীর ও জলাভূমির জন্য দুটি দেশেরই নদীমন্ত্রক আছে, আছে যৌথ নদী কমিশন আসলে প্রত্যেকেই নদীর থেকে তার প্রাপ্যটা কড়ায় গন্ডায় বুঝে নিতে চান প্রকৃত নদীর চাওয়াটা তাই আজ উপেক্ষিত।

email : anuphalderkly@gmail.com • M. 9143264159

রাজা রাউত

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

স্তন্যপায়ী

হিমালয়ের কালো ভাল্লুক

সাধারণ ইংরেজি নাম *Himalayan Black Bear/Asiatic Black Bear*

বিজ্ঞানসম্মত নাম *Ursus thibetanus*

ভারতে পশ্চিম হিমালয় থেকে শুরু করে পূর্বহিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল একদা। এখন কাশ্মীরের বনাঞ্চল আর উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স, আসাম ও অরুণাচল প্রদেশের সীমিত বনাঞ্চলে কদাচিৎ দেখা যায় এদের। ওজনে ১০০-২০০ কি.গ্রা, এই ভাল্লুকের পাহাড়ি অঞ্চল অত্যন্ত প্রিয়। যার ফলে গ্রীষ্মকালে ১০০০০-১২০০০ ফুট উচ্চতাতেও দেখা গেছে এদের। খাদ্যের ব্যাপারে এরা মোটামুটি সর্বভুক—বুনোফল, বেরি, বাদাম জাতীয় ফল খুব প্রিয়। এছাড়া কচিবাঁশের ডগা, কচিপাতা, মধু, কীটপতঙ্গ, টারমাইট এবং গুবরেপোকা এদের অপ্রিয় নয়। আজ এরা অত্যন্ত দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

অমেরুদণ্ডী

গুটি ট্যারানটুলা

সাধারণ ইংরেজি নাম *Gooty Tarantula or Ornamental Treespider*

বিজ্ঞানসম্মত নাম *Poecilotheria metallica*

এটি একটি প্রাচীন টারানটুলা জাতীয় মাকড়সার প্রজাতি। অন্ধ্রপ্রদেশ ও মধ্যভারতের বিভিন্ন বনাঞ্চলে এদের দেখতে পাওয়া যায়। 'Poecilotheria' গণের অধীনে একমাত্র নীল রঙের মাকড়সার প্রজাতি এটি। অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলার 'Gooty' নামক শহরের রেলের পড়ে থাকা কাঠের 'লগ' থেকে প্রথম এটিকে আবিষ্কার করা হয়; তাই এরূপ নাম। এটি বর্তমানে তীব্রভাবে সংকটাপন্ন একটি প্রজাতি।

পক্ষী

গোলাপী মাথা হাঁস

সাধারণ ইংরেজি নাম *Pink Headed Duck*

বিজ্ঞানসম্মত নাম *Rhodonessa caryophyllacea*

গাঙ্গেয় উপত্যকা, বাংলাদেশ এবং মায়ানমার-এ একদা প্রাপ্ত এই হাঁস আজ ভারত ও বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত। বহু গবেষণা চালিয়েও একে এখন আর দেখা যায়নি বলে বিজ্ঞানীদের দাবি। অনুমান করা হয় ১৯৫০ সালের পর ভারত থেকে সম্পূর্ণ রূপে লুপ্ত হয়ে যায়। বহু বিতর্কের পর বিশেষজ্ঞরা এখন স্বীকার করেছেন যে এটা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়নি। যেকারণে IUCN–Red Data Book-এ এটি তীব্রভাবে সংকটাপন্ন শ্রেণিতে রেখেছেন। অনুমান করা হচ্ছে যে, মায়ানমারের দুর্ভেদ্য উত্তর ভাগের জলাভূমিগুলিতে থাকতে পারে। এখনও গবেষণা চলছে এই পাখি নিয়ে। অনেক সময় 'Red Crested Pochard' কিংবা 'Indian Spot Billed Duck' এই দুটি দুর্লভ পাখির সাথে গুলিয়ে ফেলাা হয়।

উভয়চর

বোম্বে নাইট ব্যাঙ

সাধারণ ইংরেজি নাম *Bombay Night Frog or Abdulali's Wrinkled Frog*

বিজ্ঞানসম্মত নাম *Nyctibatrachus humayuni*

এটি মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট অঞ্চলেই দেখা যায়। এটি একটি এন্ডেমিক প্রজাতি। ক্রান্তীয় আর্দ্রচিরহরিৎ বর্ষাবনে পাওয়া একটি অত্যন্ত দুর্লভ প্রজাতির ব্যাঙ। ২০০৪ সালে IUCN–Red Data Book-এ বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আছে। মনে করা হচ্ছে এদের বাসস্থান ধ্বংস এবং দূষণের কারণে প্রধানত এরা আজ বিপন্ন প্রজাতি।

কাঁচরাপাড়া পৌরসভা কার্যালয়

নগর কেন্দ্র (স্থান পরিবর্তন) -৪২, লেনিন সরণি, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা
পরিবর্তে ৪২, নেতাজী সুভাষ পথ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা
দূরভাষ (০৩৩) ২৫৮৫৯৩৯১

কাঁচরাপাড়া পৌরসভার বিভিন্ন প্রকল্প

- শিক্ষার ক্ষেত্রে মিড-ডে মিল, কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী প্রকল্প।
- প্রত্যেক স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রে বিনামুল্যে চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং ঔষধ প্রদান।
- গর্ভবতী মায়েদের নাম নথিভুক্তকরণ তথা বিনামুল্যে মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।
- স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ন্যাশনাল আর্বান হেলথ্ মিশনের NUHM কাজ চলছে। NUHM প্রকল্পের আওতায় হেলথ্ সেন্টারগুলিতে টিকাকরণ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেঙ্গু, ফাইলেরিয়া, সোয়াইন ফ্লু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- পৌরসভার মাধ্যমে (NSAP) বিধবাভাতা, বার্ধক্যভাতা, বিকলাঙ্গভাতা ইত্যাদি প্রদানসহ বর্ষকালে ছাতা, শীতকালে শীতবস্ত্র (চাদর) এবং বিকলাঙ্গদের প্রতিবন্ধী সাইকেল প্রদান করা হয়েছে।
- JNNURM-এর BSUP Ph-I, Ph-II এবং Ph-III সফলভাবে রূপায়ণের পরবর্তীতে শুরু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা, HOUSING FOR ALL।
- AMRUT প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়ার্ডের পার্ক সমেত সমগ্র এলাকায় পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য 60 MGD Jetty তৈরি হচ্ছে।
- শহরের পরিচ্ছন্নতাসহ প্লাস্টিক বর্জন, সৌন্দর্য্যায়ণ, পরিবেশ সচেতনতার সম্পর্কিত প্রকল্পে স্বচ্ছ ভারত মিশন (SBM)-এর কাজ চলছে।
- কাঁচরাপাড়া শহরের মানুষের ২৪ ঘণ্টা পরিষেবার জন্য চালু রয়েছে অ্যাম্বুলেন্স এবং পৌরসভার শববাহী যান 'লোকান্তর যাত্রী'।
- শহর এবং শহর-সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে নাগরিকদের সুবিধার্থে চালু হয়েছে 'মোবাইল ইউরিনাল ভ্যান'।
- NULM প্রকল্পের মাধ্যমে শহরে রোজগার যোজন ও দারিদ্র দূরীকরণের কাজ চলছে।
- কাঁচরাপাড়া শহর জুড়ে নতুন LED LIGHT INSTALLATION-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও সি.সি.টি.ভি.-র মাধ্যমে এলাকার নজরদারীর কাজ চলছে থানার মাধ্যমে।
- GREEN CITY প্রকল্প কাঁচরাপাড়া শহরে বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

(সুদামা রায়)
পৌরপ্রধান
কাঁচরাপাড়া পৌরসভা